একক ঃ ১ প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধকতা

গঠন

১.১ সূচনা

১.২ সংজ্ঞা বা ধারণা

১.৩ সমস্যার গভীরতা

১.৪ প্রতিবন্ধকতার শ্রেণিবিভাগ

১.৫ প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ

১.৬ অধিকার ও সুযোগসুবিধা

১.৭ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজ ও পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি

১.৮ প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন

১.৯ পেশাগত সমাজকর্মীদের ভূমিকা

১.১০ উপসংহার

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১.১২ অনুশীলনী

১.১ সূচনা

মানুষের জীবন কখনই সমস্যামুক্ত হয় না। বিভিন্ন বয়সে নানান ধরনের সমস্যা মানুষের সঙ্গী । বর্তমান দিনে মানুষ অনেক বেশী সচেতন এবং অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায়ও জড়িয়ে পড়ছে। 'প্রতিবন্ধকতা' এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা মানুষ তার সৃষ্টি লগ্ন থেকে মুখোমুখি হচ্ছে। প্রতিবন্ধী মানুষরা যাতে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন – 'যতদিন না মানুষ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় ততদিন আমি পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করবো'। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভূমিকা হল প্রতিবন্ধী সহ সমস্ত মানুষের কল্যাণ করা। এই অধ্যায়ে প্রতিবন্ধকতার ধারণা, এর বিভিন্ন দিক, প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

১.২ সংজ্ঞা বা ধারণা

বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের মতো করে 'প্রতিবন্ধকতা' শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবুও বলা যায় – 'প্রতিবন্ধকতা' এমন একটি শারীরিক বা মানসিক সমস্যা যা গতিশক্তি, সংজ্ঞাবহ ও অন্যান্য বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। প্রতিবন্ধী মানুষ বলছে এমন মানুষকে বোঝায় যার শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা কর্মে নিযুক্তির অন্তরায়। আরও বলা যায় 'প্রতিবন্ধকতা' হল এমন একটি প্রকট বা প্রচ্ছন্ন শারীরিক বা মানসিক বিকলতা যা তার কর্ম ক্ষমতা হ্রাস করে এবং একটি বিশেষ (প্রতিকূল) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আহ্বান করে।

একজন প্রতিবন্ধী মানুষ স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে আলাদা। সহজে চলাফেরা করা স্বাভাবিক ভাবে যোগাযোগ করা, নিজের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষরা পিছিয়ে থাকে। সুতরাং, একজন মানুষকে তখনই প্রতিবন্ধী বলা যায় যদি সে শারীরিক বা মানসিক ভাবে কর্মক্ষম অবস্থায় না থাকে।

১.৩ সমস্যার গভীরতা

প্রতিবন্ধকতা বলতে আমরা শুধু শারীরিক অক্ষমতা বুঝি না তার সঙ্গে মানসতাত্ত্বিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক অবসাদ বা হতাশা যুক্ত থাকে। ১৯৫৯-৬১, ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭২-৭৪ সালে ন্যাশনাল স্যাম্-পল্ সার্ভে (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা) এর মাধ্যমে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এবং দেখা গেছে ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫ কোটি মানুষ প্রতিবন্ধী। এবং তাদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী বিভিন্ন কল্যাণমূলক বা পুনর্বাসন কর্মসূচিতে উপকৃত। অর্থাৎ বৃহত্তর অংশই সৃজনশীল, অর্থবহ জীবনযাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অতীতে যৌথ পরিবারগুলি তাদের পরিবারে প্রতিবন্ধী মানুষ থাকলে তার সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক দায়িত্ব বহন করত। বর্তমানে যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে প্রতিবন্ধীরা পূর্বের মতো আর সুযোগসুবিধা পাচ্ছে না। যার ফলে প্রতিবন্ধীদের যত্ন এবং পুনর্বাসন উভয় ক্ষেত্রে জটিলতা বেড়েছে।

১.৪ প্রতিবন্ধকতার শ্রেণিবিভাগ

ক) শারীরিক

১) পোলিও

২) অন্ধত্ব

৩) বধিরত্ব

৪) রিকেট্

৫) ল্যাথাইরিজম্

৬) যক্ষা, কুষ্ঠ, হাম এবং অপুষ্টি থেকে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা

৮) বাত

৯) পুড়ে যাওয়ার ফলে অঙ্গাবিকৃতি

খ) মানসিক

১) মানসিক প্রতিবন্ধী (অপূর্ণ বিকাশ)

২) সেরিব্রাল পলসি

৩) ডিভেলপমেনট্ ডিলে (খুব ধীর শিক্ষার্থী)

৪) অউটিজিম্

১.৫ শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিম্নে আলোচনা করা হল –

১) বাবা-মায়ের কিছু জীনগত রোগ বা কারণ যা বংশানুক্রমে সন্তান সন্ততিতে বর্তায়,

২) ৩৫ বছরের পরে মহিলারা সন্তান ধারণ করলে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশু জন্মাতে পারে,

৩) গর্ভাবস্থার প্রথমের দিকে রুবেলা এর মতো কিছু সংক্রমণ,

৪) ঔষধের অপব্যবহার বা অধিক ব্যবহার,

৫) গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় এবং প্রসব পরবর্তীকালে উপযুক্ত যত্ন-পরিচর্যার অভাব,

৬) জন্মের সময় শিশুর উপযুক্ত পরিচর্যা না করলে আঘাত ও আনুষঙ্গিক কারণ,

৭) গর্ভাবস্থায় এবং তার পূর্বে মায়ের অপুষ্টি,

৮) প্রসবকালে মায়ের মৃত্যু হলে শিশু উপযুক্ত যত্ন পায় না,

৯) নবজাতকের পুষ্টির অভাবে অন্ধত্বের মতো প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়,

১০) নিয়মিত টিকাকরণ না করালে পোলিও এর মতো অসুখ,

১১) খাদ্য বিষক্রিয়ার ফলে এবং অতিমাত্রায় পরিবেশ দূষণের ফলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা,

১২) কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, যক্ষা এবং অন্যান্য কিছু সংক্রামণ

১৩) শিশু নিয়মিত যত্ন চেক-আপ না করালে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা না গ্রহণ করলে মূক-বধিরত্বের সমস্যা,

১৪) দুর্ঘটনা,

১৫) যুদ্ধ, নির্মাণ কাজ, শিল্প, বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি কারণে অনেকে প্রতিবন্ধী হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে কেবল মাত্র দারিদ্র্য প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী নয়। চিরাচরিত সামাজিক প্রথা, কুসংস্কার, অযত্ন ইত্যাদি কারণও শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী।

১.৬ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সরকার বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ও অধিকার প্রদান করেছেন। সেগুলি যাতে তারা পেতে পারে তার জন্য কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেমন–

১) দ্যা পার্সনস্ উইথ ডিসএবিলিটিস্ এক্ট্, ১৯৯৫

২) দ্যা ন্যাশন্যাল, ট্রাস্ট এক্ট্, ১৯৯৯

৩) রিহ্যাভিলিটেশন্ কাউন্সিল অব্ ইন্ডিয়া এক্ট্, ১৯৯২

১৯৯৫ সালের পি.ডব্লিউ.ডি. এক্ট্ এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য নিম্নলিখিত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে–

১) ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গড়া এবং সেই কমিটির মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা–

ক) প্রতিবন্ধীদের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত জাতীয় আইন তৈরি করা,

খ) বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি করার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া,

গ) আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থা যাতে তাদের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে তা দেখা,

ঘ) নীতির পুনর্মূল্যায়ন

ঙ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল ও সাধারণ জীবনে সমস্ত ধরনের বাধা দূর করা,

চ) বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইত্যাদি।

২) ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের সেক্রেটারির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় এক্সিকিউটিভ্ কমিটি গঠন করতে হবে এবং এই কমিটির কাজ হবে কেন্দ্রীয় সমন্বয় সিদ্ধান্ত রূপায়িত করা।

৩) সমস্ত রাজ্য রাজ্যস্তরে সমন্বয় কমিটি গড়বে এবং এই আইনে প্রদেয় কাজকর্ম রূপায়িত করবে। বস্তুতপক্ষে এই কমিটির কাজ কেন্দ্রীয় কমিটির মতোই তবে, তা রাজ্যস্তরে সীমাবদ্ধ।

রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী এই কমিটির চেয়ারম্যান্ হবেন।

৪) রাজ্য সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের সেক্রেটারির নেতৃত্বে রাজ্যস্তরে এক্সিকিউটিভ্ কমিটি গঠন করতে হবে এবং এই কমিটির কাজ হবে রাজ্যস্তরের সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত রূপায়িত করা।

এই আইনের অধীনে প্রদেয় অধিকার ও সুযোগ সুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল–

১) শিক্ষা

- ১৮ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা;
- সাধারণ স্কুলগুলিতে তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা;
- তাদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন;
- ঐ সকল বিশেষ বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
- প্রয়োগমুখী সাক্ষরতা, পঞ্চম মানের মধ্যে স্কুলছুটের সমস্যা কাটিয়ে আনা;
- মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা;
- বই ও অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ;
- শিক্ষা সংক্রান্ত নতুন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা;
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে যাতায়াতের ব্যবস্থা বা যাতায়াতের জন্য আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি।

২) চাকুরি

- প্রতিবন্ধীদের উপযোগী পদ শনাক্ত করা
- কমপক্ষে ৩ শতাংশ পদ প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে, তার ১ শতাংশ অন্ধ-দুর্বল দৃষ্টি সম্পন্ন, বধির অথবা সেরিব্রাল পলসি মানুষদের জন্য।
- বিশেষ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন
- প্রতিটি নিয়োগকারী সংস্থা এরূপ কর্মীর নথি রাখবে।
- যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুদান পায় তারা অবশ্যই ৩ শতাংশ আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত করবে।
- দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩ শতাংশ সংরক্ষণ।
- প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্ব বা সরকার নিয়োগকারীদের সাহায্য করবে।

৩) অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

- সরকার প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের প্রকল্প তৈরি করবে।
- স্থানীয় সরকার ও নেতৃত্ব প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে গৃহ নির্মাণ, দোকান ঘর তৈরি, বিশেষ স্কুল, গবেষণা কেন্দ্র, শিল্প ইত্যাদি স্থাপনের জন্য ন্যূনতম মূল্যে জমি বিতরণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

- রাস্তায় এবং যানবাহনে যাতে বৈষম্য না থাকে,
- সরকারি চাকুরিতে এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেন বৈষম্য না থাকে,
- বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পেশাগত পরিষেবায় দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ, পুনর্বাসন, সহায়তা প্রদান ও পদ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য সহায়তা,
- কেবলমাত্র নথিভুক্তকারী সংস্থাগুলি যাতে প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিষেবা প্রদান করতে পারে,
- সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রদেয় পরিষেবার সমন্বয়, তদারকি এবং রিপোর্ট তৈরির জন্য মুখ্য কমিশনার নিয়োগ করবেন,
- সরকার পুনর্বাসন নীতি, বীমা প্রকল্প, বেকারদের জন্য ভাতা প্রদানের প্রকল্প প্রণয়ন করবেন।

এইভাবে, বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, উপযুক্ত কাজের পরিবেশ, জমির মালিকানা, ক্রীড়া ও বিনোদনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

১.৭ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজ ও পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিবন্ধীদের সাধারণত ভয়, বৈষম্য ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। এরূপ বদ্ধমূল দৃষ্টিভঙ্গি পরিবার ও সমাজে শত শত বছর ধরে অপরিবর্তিত। গ্রাম ও শহরে নিরক্ষর-শিক্ষিত সমস্ত মানুষের মধ্যে এই ধরনের সামাজিক অপবাদ দেওয়া তথা বৈষম্যমূলক মনোভাব দেখা যায়। প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে যে সব অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করা হয় তা থেকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত সমস্ত সমাজে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অবজ্ঞা ও বিব্রত বোধ করা হয়। পরিবারের সদস্যরা ভাবে এটা তাদের পরিবারের সামাজিক পদমর্যাদার ক্ষতি সাধন করে। ধর্মেও সঠিকভাবে বোঝার বদলে করুণার কথা বলা হয়েছে। এরূপ নেতিবাচক মনোভাব ভয়ংকর। যদি সমাজ কিংবা পরিবার সবসময় বিদ্রুপ বা করুণা প্রদর্শন করে এবং তার প্রতিবন্ধকতা মনে করিয়ে দেয় তবে সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি জটিল হয়।

অনেক সময় বাবা-মায়েরা বেশি করে করুণাপ্রবণ হয়ে পড়েন। এর ফলে তারা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সে কি পারে না তা বার বার না বলে, সে কি পারে তার উপর বাবা-মা কে গুরুত্ব দিতে হবে। বাবা-মা এবং সমাজের এরূপ সদর্থক মনোভাব তাদের জীবন ও জীবিকার সহায়ক। স্বাস্থ্য পরিষেবা ছাড়াও কাউন্সেলিং, সদর্থক মনোভাব এবং বিভিন্ন সহায়ক সরঞ্জামও গুরুত্বপূর্ণ।

১.৮ প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন

বাবা-মাকে শিক্ষা দানের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। তাছাড়া সুসংহতভাবে কিছু কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। 'পুনর্বাসন' কথাটির অর্থ হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা এবং সামাজিক স্বীকৃতি। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে প্রতিবন্ধী, তাদের পরিবারের সদস্য-বিশেষ করে তাদের বাবা-মা, বৃহত্তর সমাজ, সরকার এবং বেসরকারি সংস্থা সকলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পুনর্বাসনের

মধ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চাকুরি, স্ব-নিযুক্তি, চিকিৎসা পরিষেবা, উপযুক্ত বাসস্থান, উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে বিষয়গুলি আলোচনা করা হল–

ক) **শিক্ষা ঃ** প্রতিবন্ধী শিশুরা স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। তাদের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করতে হবে কিংবা শিক্ষার জন্য খরচ বহন করতে হবে। উপযুক্ত সংখ্যক বিশেষ বিদ্যালয় যেমন – মূক-বধির এবং অন্ধদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

খ) **আয় বাড়াবার সুযোগ ঃ** সরকার, পৌরসভা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং বে-সরকারি সংস্থা প্রতিবন্ধী মানুষদের আয় বাড়াবার জন্য চাকুরি বা স্ব-নিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করবে। তাদের প্রতিবন্ধকতার ধরন অনুসারে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প চালু করা যেতে পারে।

গ) **বাসস্থান ঃ** শহর এবং গ্রাম উভয় স্থানে গরীব বা দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে বিতরণ করা হয়। সরকারি কর্মী ঐ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষদের অগ্রাধিকার দেন। যদি টাকা দিতে হয় তবে প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কম টাকা লাগবে।

ঘ) **চিকিৎসা পরিষেবা ঃ** প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা এবং কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শ্রবণ যন্ত্র ইত্যাদি দরকার। তাদের অধিকাংশের ক্রয় ক্ষমতা থাকে না। চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা খুবই অপ্রতুল। সরকার এবং সামাজিক সংগঠন এ ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ঙ) **যাতায়াত ঃ** সাধারণত প্রতিবন্ধী মানুষরা যানবাহনে বিনামূল্যে ভ্রমণ করতে পারে। প্রাইভেট যানবাহনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বা কম খরচে যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের উপযোগী যন্ত্র চালিত তিন চাকার গাড়ি ন্যূনতম মূল্যে দেওয়া উচিত।

চ) **চাকুরি কিংবা স্ব-নিযুক্তির** জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যে সকল সরকারি বা বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ দেয় তাদের উচিত প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

মনে রাখতে হবে, এরূপ মানুষের পুনর্বাসন খুবই কঠিন কাজ। এরজন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা ও সুসংহত প্রয়াস দরকার। সরকার এককভাবে এই কাজ করতে পারে না। সুতরাং উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত সকলকেই এই কাজ করতে হবে। জনসাধারণকে সচেতন না করতে পারলে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সফল হবে না।

১.৯ পেশাগত সমাজকর্মীদের ভূমিকা

প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে পেশাগত সমাজকর্মীদের নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলি হল–

১) প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধে উপযুক্ত সংস্থার সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞের সাহায্যে জনসাধারণকে সচেতন করা,

২) বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য যে সকল পরিষেবা রয়েছে সে সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ,

৩) প্রতিবন্ধী মানুষদের শনাক্ত করা এবং নিকটবর্তী কেন্দ্রে পাঠানো যাতে তারা সহজে সুযোগ সুবিধা পায়,

৪) প্রতিবন্ধীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা উচিত সে সম্বন্ধে তাদের বাবা-মা ও পরিবারের লোকজনদের জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবা,

৫) এলাকার জনসাধারণ যাতে করুণা বা ঘৃণা প্রদর্শন না করে তার জন্য সচেতন করা,

৬) তারা যে সকল সংস্থার সঙ্গে জড়িত সেখানে চাইল্ড্ গাইডেন্স্ কেন্দ্র সহ অন্যান্য সব পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা,

৭) প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা,

৮) তাদের জন্য খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

১.১০ উপসংহার

এই অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ও তাদের প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত সমস্যা, বিভিন্ন কল্যাণমূলক সরকারি পদক্ষেপ ইত্যাদি বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া বে-সরকারি সংস্থাগুলির প্রদেয় পরিষেবা সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, যে প্রতিবন্ধী মানুষরা রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাহীন, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার দিক থেকে তারা পিছিয়ে। এরূপ পরিস্থিতি মাথার রেখে 'কোঠারী' কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে – প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা কেবল মানবিকতার খাতিরে নয়, তা যেন ব্যবহারিক শিক্ষা হয়। তারা যাতে সামাজিক ন্যায় বিচার পায় তার জন্য সুসংহত প্রচেষ্টা দরকার। বর্তমানে যে সকল কল্যাণমূলক কর্মসূচি রয়েছে তা খুবই উপযুক্ত কিন্তু, অপ্রতুল। কেবল প্রতিবন্ধীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ঐ সকল সুবিধা ভোগ করছে। সুতরাং, আরও বেশি প্রতিবন্ধী মানুষদের সুযোগ দিতে হবে। কেবলমাত্র সরকার এই কাজ করতে পারবে না। বে-সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আরও বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১) দ্যা গ্যজেট্ অব্ ইন্ডিয়া

২) পশ্চিমবঙ্গ (ডিসেম্বর-২০০৬)

৩) দ্যা ন্যাশন্যাল ট্রাস্ট এক্ট্- ১৯৯৯, মিনিস্ট্রি অব্ সোশ্যাল জাস্টিস্ এন্ড কোম্পানী এফেয়ারস্।

১.১২ অনুশীলনী

১) প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বোঝেন? এর কারণগুলি আলোচনা কর।

২) প্রতিবন্ধকতার ধরনগুলি লিখুন। অন্ধত্ব ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৩) পুনর্বাসন বলতে কী বোঝেন? প্রতিবন্ধী মানুষদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত সরকারি পদক্ষেপ আলোচনা করুন।

৪) প্রতিবন্ধী মানুষদের শিক্ষা ও চাকুরি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা আলোচনা করুন।

একক ঃ ২ শিশু বিকাশ ও শিশু সুরক্ষা

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ ভারতে শিশুদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

২.৪ শিশুদের বিকাশকালীন প্রয়োজনীয়তা, পিতামাতার, পরিবার এবং বন্ধুদের ভূমিকা

২.৫ শিশু উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প

২.৬ শিশু সুরক্ষা – সাংবিধানিক সুরক্ষা, শিশুর অধিকার

২.৭ শিশুদের নির্যাতন – ধরন, প্রভাব

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.৯ অনুশীলনী

২.১ ভূমিকা

শৈশবের বৈশিষ্ট্য হল – অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা। শিশু বিকাশ ও শিশু সুরক্ষার কাজে যুক্ত সমাজকর্মীদের, শৈশবের বিভিন্ন ধাপ এবং বয়স অনুসারে বিকাশ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ সংক্রান্ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ কর্মীদের আরও জানতে হবে শিশুদের বিকাশকালীন প্রয়োজনীয়তা, পিতামাতা, পরিবার ও বন্ধুদের ভূমিকা, শিশু উন্নয়নে সরকারি নীতি, প্রকল্প, সাংবিধানিক সুরক্ষা, অধিকার এবং বর্তমান সমাজে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলি। যে সব সমাজ কর্মীরা শিশু বিকাশ কাজে যুক্ত তারা শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা দিতে পারে। এই ভূমিকা শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.২ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় শেষ করে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবে –

- ভারতীয় শিশুদের জনসংখ্যাগত চিত্র এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা;
- পিতামাতা, পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের ভূমিকা এবং বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প;
- সাংবিধানিক সুরক্ষা, আইন, শিশুর অধিকার;
- শিশুদের যাতে অপব্যবহার না করা হয় সে ব্যাপারে এবং নির্যাতিত শিশুদের সাহায্য করতে পারবে।

২.৩ ভারতে শিশুদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

২০০১ সালে ভারতে শিশুদের সংখ্যা ১০ কোটি যা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ০ তেকে ১৮ বছর বয়সি শিশুদের সংখ্যা ৩৯ কোটি ৮৩ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। এবং ০-৫ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা ১১ কোটি ৫ লক্ষ।

বিশ্ব জনসংখ্যা, ভারতের জনসংখ্যা ও শিশুদের জনসংখ্যা (০-৫ বছর, ০-১৮ বছর), ১৯৯৯

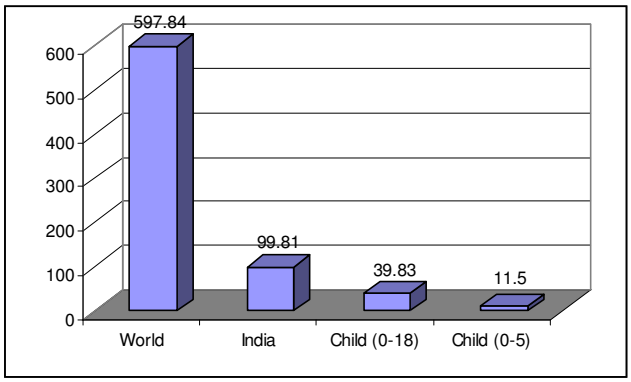

উৎস – ইউ.এন.এফ.পি.এ. – ১৯৯৯, ইউনিসেফ – ২০০১।

দ্যা ইন্ডিয়ান চাইল্ড, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, ২০০২

নিম্নে ২০০১ সালে ০-৬ ও ৭-১৪ বছর বয়সের শিশুদের পরিসংখ্যান দেওয়া হল–

বয়স	মোট শিশু	ছেলে	মেয়ে
০–৬	১৬৩,৮১৯,৬১৪	৮৪,৯৯৯,২০৩	৭৮,৮২০,৪১১
মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে শতকরা হার	১৫.৯	১৬.০	১৫.৯
৭–১৪	১৯৯,৭৯১,১৯৮	১০৪,৪৮৮,১১৯	৯৫,৩০৩,০৭৯
মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে শতকরা হার	১৯.৪	১৯.৬	১৯.২

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (২) অনুসারে শিশুদের সংখ্যা নিম্নে আলোচনা করা হল –

বয়স	মোট	ছেলে	মেয়ে
০–৪	১১.৭	৬.০	৫.৭
৫–৯	১০.৯	৫.৬	৫.৩
১০-১৫	১১.০	৫.৭	৫.৩
১৫–১৯	১০.৩	৫.৩	৫.০

নিম্নে বিভিন্ন রাজ্যে মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে ০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের সংখ্যা দেওয়া হল (১৯৯৮)–

বিভিন্ন রাজ্য	মোট			গ্রাম			শহর		
	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৩.১	৩৩.৬	৩২.৭	৩৩.৬	৩৪.২	৩২.৯	৩১.৭	৩১.৬	৩১.৯
আসাম	৩৭.৬	৩৭.৩	৩৮.০	৩৮.৬	৩৮.৩	৩৮.৯	২৯.২	২৮.৫	২৯.৯
বিহার	৪০.৮	৪১.৩	৪০.২	৪১.৩	৪২.০	৪০.৭	৩৫.৬	৩৫.২	৩৬.০
গুজরাট	৩২.৭	৩৩.৪	৩২.১	৩৩.৭	৩৪.৪	৩২.৯	৩০.৭	৩১.২	৩০.২
হরিয়ানা	৩৬.২	৩৬.৭	৩৫.৬	৩৭.০	৩৭.৫	৩৬.৬	৩৩.১	৩৪.০	৩২.০
হিমাচল প্রদেশ	৩১.৭	৩৩.৯	২৯.৭	৩২.০	৩৪.৪	২৯.৮	২৭.৬	২৭.৮	২৭.৩
কর্ণাটক	৩১.৪	৩১.৮	৩১.০	৩২.৪	৩২.৮	৩২.০	২৯.১	২৯.৫	২৮.৬
কেরালা	২৭.৩	২৯.০	২৫.৭	২৭.৯	২৯.৭	২৬.৩	২৫.৩	২৬.৯	২৩.৮
মধ্যপ্রদেশ	৩৮.২	৩৮.৬	৩৭.৮	৩৯.২	৩৯.৬	৩৮.৭	৩৩.৩	৩৩.৩	৩৩.২
মহারাষ্ট্র	৩৩.৩	৩৩.৮	৩২.৮	৩৫.২	৩৬.২	৩৪.৩	৩০.২	৩০.১	৩০.৩
উড়িষ্যা	৩৪.২	৩৪.৭	৩৩.৭	৩৪.৭	৩৫.৩	৩৪.১	৩০.৬	৩০.৩	৩১.০
পাঞ্জাব	৩১.৮	৩২.৯	৩০.৬	৩২.১	৩৩.২	৩০.৮	৩১.০	৩১.৯	২৯.৯
রাজস্থান	৩৮.৩	৩৮.৮	৩৭.৭	৩৯.১	৩৯.৫	৩৮.৫	৩৪.৭	৩৫.৩	৩৪.০
তামিল নাড়ু	২৮.১	২৮.৭	২৭.৫	২৮.৯	২৯.৫	২৮.৩	২৬.৪	২৭.০	২৫.৮
উত্তর প্রদেশ	৪০.১	৪০.৬	৩৯.৭	৪০.৮	৪১.৩	৪০.৩	৩৬.৫	৩৬.৭	৩৬.৩
পশ্চিমবঙ্গ	৩২.৮	৩২.৭	৩৩.০	৩৫.৪	৩৫.৫	৩৫.৪	২৫.৫	২৪.৯	২৬.১
ভারত	৩৫.৬	৩৬.১	৩৫.১	৩৭.০	৩৭.৬	৩৬.৩	৩০.৯	৩১.১	৩০.৭

উৎস – রেজিস্ট্রার জেনারেল, (২০০১), এস.আর.এস. রিপোর্ট–১৯৯৮
দ্যা ইন্ডিয়ান চাইল্ড, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, ২০০২

উপরোক্ত সারণি থেকে বলা যায় শিশুদের শতকরা হার বিহারের সবচেয়ে বেশি (৪০.৮), তারপর উত্তর প্রদেশ (৪০.১), রাজস্থান (৩৮.৩), মধ্য প্রদেশ (৩৮.২), আসাম (৩৭.৬) এবং হরিয়ানায় (৩৭.২)। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সমস্ত রাজ্যে গ্রাম-শহর উভয় এলাকায় লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান।

শিশুদের বিশেষ করে মেয়েদের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে হলে সেক্স রেসিও বিশ্লেষণ করতে হবে। ১৯৮১, ১৯৯১ এবং ২০০১ সালের লোকগণনা অনুসারে নিম্নে সেক্স রেসিও দেওয়া হল–

১৯৮১	৯৬২
১৯৯১	৯৪৫
২০০১	৯২৭

উপরের সারণি থেকে স্পষ্টই অনুধাবন করা যায় যে ০-৬ বছর বয়সীদের মধ্যে সেক্স রেসিও ক্রমশ কমছে। এবং ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের মতে এই নিম্নগামী প্রবণতা ভবিষ্যতে দেশের মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে নির্ধারিত সেক্স রেসিওকে প্রভাবিত করবে। ০-৬ বছরের মধ্যে যে অনুপাত ও বৈষম্য দেখা যাচ্ছে তা দূর করা প্রায়ই অসম্ভব এবং দীর্ঘদিন তা জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করবে।

রেজিস্ট্রার জেনারেলের রিপোর্ট থেকে শিশুদের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক অনুপাত সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্য জানা যায় – দাদরা - নগর হাভেলি - ১০০৩, লাক্ষাদ্বীপ - ৯৯৯, ছত্রিশগড় - ৯৮২, মেঘালয় - ৯৭৩, ঝাড়খণ্ড-৯৭৩ এই সব রাজ্যে সেক্স রেসিও আশাপ্রদ বলা যায়। ২৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে জাতীয় গড়ের তুলনায় অবস্থা ভালো। অন্য বারোটি স্থানের গ্রামাঞ্চলে এই অনুপাত খুবই কম। দিল্লি, চণ্ডিগড়, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবে অনুপাত সবচেয়ে খারাপ (৮৫০-৭৯৯)। শহরাঞ্চলে জাতীয় স্তরে অনুপাত খুবই কম (৯০৬) এবং ১৯৯১ সালে ৯৫৩ ছিল। ২০০১ সালের লোকগণনা অনুসারে ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে অনুপাত খুবই কম এবং এর কারণ হল, কন্যাভ্রূণ হত্যা।

শিশুমৃত্যু হল দেশের মানব উন্নয়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ১৯৫১ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যু ১৪৬ থেকে কমে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ৬৮।

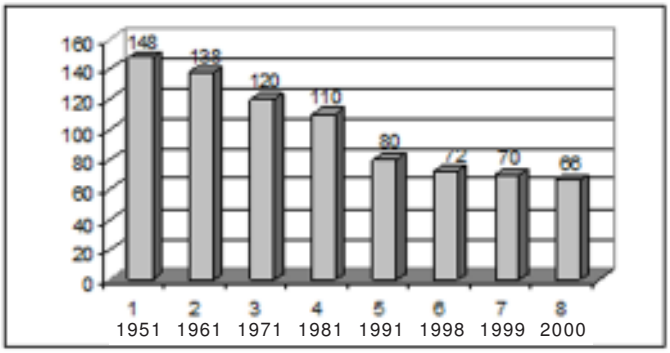

উৎস – স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার (২০০০), রেজিস্ট্রার জেনারেল (২০০১)

নিম্নে রাজ্য ভিত্তিক শিশুমৃত্যুর চিত্র (১৯৯৮) দেওয়া হল –

রাজ্য	৫ বছরের মধ্যে	১ বছরের মধ্যে	নব-জাতক	পেরি ন্যাটাল	মৃত সন্তানের জন্ম
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৮	৬৬	৪৬	৫	১৭
আসাম	২৮	৭৬	৫১	৪৯	১১
বিহার	২৩	৬৭	৪৪	৩৭	৪
গুজরাট	২০	৬৪	৪৪	৩৮	৪
হরিয়ানা	২২	৭০	৪১	৩৯	১২
হিমাচল প্রদেশ	১৭	৬৩	৫০	৫০	১২

রাজ্য	৫ বছরের মধ্যে	১ বছরের মধ্যে	নব-জাতক	পেরি ন্যাটাল	মৃত সন্তানের জন্ম
কর্ণাটক	১৭	৫৮	৪২	৫৪	২১
কেরালা	৪	১৬	১১	১৫	৬
মধ্যপ্রদেশ	৩৩	৯৮	৬১	৫১	৭
মহারাষ্ট্র	১৩	৪৯	২৯	৩৫	১১
উড়িষ্যা	২৯	৯৮	৬০	৬১	১৭
পাঞ্জাব	১৭	৫৪	৩৩	৪২	১৭
রাজস্থান	২৮	৮৩	৫০	৪৫	৬
তামিল নাড়ু	১৩	৫৩	৩৫	৪১	১৩
উত্তর প্রদেশ	৩০	৮৫	৫২	৪৪	৬
পশ্চিমবঙ্গ	১৫	৫৩	৩০	৩০	৮
ভারত	২২	৭২	৪৫	৪২	৯

উৎস – রেজিস্ট্রার জেনারেল (২০০১), এস. আর. এস. রিপোর্ট - ১৯৯৮

অপূর্ণাঙ্গ শিশুর জন্ম, শ্বাস নালীতে সংক্রমণ, ডাইরিয়া, অপর্যাপ্ত বা অনিয়মিত টীকাকরণ, নবজাতকের যত্নের অভাব ইত্যাদি ভারতে অধিক শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী। (রেজিস্ট্রার জেনারেল, ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ডিভিশন - ২০০০, গ্রামাঞ্চলে মৃত্যুর কারণ সংক্রান্ত সমীক্ষা, বার্ষিক প্রতিবেদন)

☐ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- প্রতি পাঁচটির মধ্যে একটি শিশু ভারতে বাস করে।
- প্রতি তিনটি অপুষ্ট শিশুর মধ্যে একটি ভারতে বাস করে।
- ভারতে প্রতি দুজন শিশুর মধ্যে একজন রক্তাল্পতার শিকার।
- প্রতি চারজন শিশুর মধ্যে একজন রক্তাল্পতার শিকার।
- আয়োডিনের অভাবে নবজাতকেরা প্রতি মুহূর্তে বিকাশের ক্ষমতা (লার্নিং ক্যাপাসিটি) হারাচ্ছে।
- ০-৬ বছরের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত খুবই কম। হাজার ছেলে থাকলে মাত্র ৯৩৩ কন্যা শিশু।
- অপুষ্টি শিশুর বিকাশ ও শিক্ষার ক্ষমতা হ্রাস করে।
- জন্ম নথিভুক্তকরণ মাত্র ৫৫ শতাংশ।
- প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের ভর্তি মাত্র ৪৩ শতাংশ।
- প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় ছুট - ৪০ শতাংশ।
- দেশে ১০৪ লক্ষ শিশু শ্রমিক (এস.আর.ও - ২০০০)।

- শিশুমৃত্যু প্রতি হাজারে ৬৮ (এন.এফ.এইচ.এস-২)।
- মাতৃমৃত্যু প্রতি ১০০,০০০ প্রসবে (জীবিত) ৪০৭ (এস.আর.এস.-১৯৯৮)।
- জন্মের সময় কম ওজন - ৪৬ শতাংশ (এন.এফ.এইচ.এস-২)।
- তিন বছরের শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতা - ৭৪ শতাংশ (এন.এফ.এইচ.এস-২)।
- টীকাকরণ খুবই কম (পোলিও-৫৮ শতাংশ, হাম-৫০ শতাংশ, ডিপিটি-৪৬ শতাংশ, বিসিজি-৬৭ শতাংশ, অন্যান্য-৪২ শতাংশ – এন.এফ.এইচ.এস-২)।
- ৬৭ শতাংশ, অন্যান্য-৪২ শতাংশ – এন.এফ.এইচ.এস-২)।

তথ্যের উৎস - একাদশ (২০০৭-২০১২) পরিকল্পনার জন্য শিশু উন্নয়নের ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্ট।

২.৪ শিশুদের বিকাশকালীন প্রয়োজনীয়তা, পিতামাতার, পরিবার এবং বন্ধুদের ভূমিকা

সমাজকর্মী হিসাবে শিশুদের বিকাশকালীন চাহিদা সবচেয়ে ভালো করে বোঝা যায় জন বউলবাই (১৯৬৯ এবং ১৯৮৮) ও পরবর্তীকালে মেরী আইনস্মিথ (১৯৭৮) এর এট্যাচ্‌মেন্ট থিওরির মাধ্যমে।

ক্লাউস্ ও ক্যান্যালের মতে এটাচ্‌মেন্ট হল – দুই ব্যক্তির মধ্যে একধরনের স্নেহের বন্ধন যা স্থান কালের অতীত এবং দু-জনকে ভাবাবেগের মাধ্যমে একত্রিত করে। পহলবার্গের মতে – এট্যাচ্‌মেন্ট শিশুকে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করে–

- পূর্ণ বৌদ্ধিক বিকাশ
- অনুভূতির বহির্প্রকাশ
- যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা
- ভালো-মন্দ বিচার করার শক্তি
- স্বাবলম্বন
- বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতি ও হতাশার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো
- ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই
- ভবিষ্যতের সম্পর্ক তৈরি
- ঈর্ষাপরায়ণ না হতে সাহায্য করে--

এবং পহলবার্গের মতে - এট্যাচমেন্ট না থাকলে শিশুর মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা দিতে পারে–

- ভালো-মন্দ বিচার বোধের অভাব
- আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না
- আত্ম-মর্যাদাবোধ থাকে না
- পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো থাকে না
- আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ সঠিক হয় না

- কার্য কারণ বিচার করতে পারে না
- ব্যবহার স্বাভাবিক নাও হতে পারে
- ব্যক্তিত্ব গঠন ও সামাজিকীকরণ সঠিকভাবে হয় না
- বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে পারে না ইত্যাদি।

হোমসের (১৯৯৩) মতে এট্যাচমেন্ট থিওরির মূল বিষয়গুলি হল

● এট্যাচমেন্ট সংক্রান্ত মূল বিষয় সবসময় শিশুকে খাওয়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এটি প্রায় সাত মাস বয়সে আসে এবং মূলত শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এট্যাচমেন্ট।

● শিশুর সান্নিধ্য চাওয়া থেকে এট্যাচমেন্ট সম্পর্ক বোঝা যায়। বিপদ বা সমস্যার দেখা দিলে শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে সান্নিধ্য চাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

● সুরক্ষিত সম্পর্কের মধ্যে শিশু বৃহত্তর জগৎকে জানার ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করে।

● যার সঙ্গে শিশুর এট্যাচমেন্ট তার কাছ থেকে শিশুকে সরিয়ে নিলে শিশু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে, বিপন্ন বোধ করে এবং তার কাছে আবার ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে। বরাবরের জন্য যদি শিশুকে সরিয়ে নেওয়া হয় তবে শিশুর নিরাপত্তা ও ব্যবহারে তার প্রতিফলন ঘটতে পারে।

● প্রাথমিক এট্যাচ্‌মেন্টের অভিজ্ঞতা থেকে একটি অন্তর্নিহিত কার্যকরী মডেল তৈরি হয় যা পরবর্তীকালে সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে।

● সারা জীবন ধরে এট্যাচ্‌মেন্ট ব্যাপারটি থাকে এবং আবশ্যিক নির্ভরশীলতা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বন্ধুবান্ধব এবং পিতামাতার উপর নির্ভরশীলতা জন্মায়।

মেরী আইনসওয়ার্থ মায়েদের সঙ্গে শিশুর এট্যাচ্‌মেন্ট পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি অজানা ব্যক্তির সামনে মায়েদের থেকে শিশুকে সরিয়ে নেওয়া, এবং পুনরায় মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং প্রতি ক্ষেত্রে শিশুদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিক্রিয়াগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল–

সিকিওর এট্যাচ্‌মেন্ট (টাইপ-বি)

শিশু চেষ্টা করে কখন সে মা-কে পাবে এবং মায়ের অনুপস্থিতিতে বিপর্যস্ত বোধ করে এবং খোঁজ করা বন্ধ করে। যখন সে ফিরে আসে তখন শিশু তার সান্নিধ্যে আসার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। অজানা ব্যক্তির সামনে সে দৃঢ়ভাবে বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। বাড়িতে যারা নিরাপদভাবে সান্নিধ্য পায় তারা কম কাঁদে, উদ্বিগ্ন হয় না, অসহযোগিতাও করে না। এক্ষেত্রে মায়ের ব্যবহারও দেখা হয়েছে। মায়ের ব্যবহারও সদর্থক, স্পর্শকাতর এবং শিশুকে সান্নিধ্যে আসতে উৎসাহ যোগায়।

এঙ্‌ক্শাস এভয়ড্যান্ট্ ইনসিকিওর এট্যাচ্‌মেন্ট্ (টাইপ-এ)

শিশু আলাদা হলে খুব একটা হতাশা ব্যক্ত করে না, মা ফিরে এলে মিলিত হতে চায় না, অনেকে তাকে অবজ্ঞা করে। মায়ের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, অজানা ব্যক্তির প্রতিও একই ধরনের ব্যবহার করে। মায়ের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত উদাসীন, আগ্রহহীন, অনেক সময় ক্রোধ প্রকাশ পায়।

এঙ্ক্শাস রেজিসট্যানস্ বা এম্-বিভ্যালেন্ট ইনসিকিওর এট্যাচ্মেন্ট্ (টাইপ-সি)

শিশু মা-কে ছেড়ে থাকার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বোধ করে, ছাড়ার সময় খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে, পুনর্মিলনের সময় উভয়সঙ্কটে পড়ে – সান্নিধ্য চায় আবার বাধা দেয়। বাড়িতে এই সব শিশু খুব কাঁদে, হতাশা ব্যক্ত করে এবং শারীরিক সান্নিধ্য চায় না। মায়ের ব্যবহার উন্ন কিন্তু শিশুর চাহিদার প্রতি উদাসীন এবং সঠিক সময়ে শিশুর প্রতি নজর দেয় না।

ডিস্অর্গানাইজড, ডিস্ অরিয়েন্টেড ইনসিকিওর এট্যাচমেন্ট্ (টাইপ-ডি)

শিশু ব্যবহারে বৈপরীত্য দেখা যায়। যখন ধরা হয় তখন দূরে চলে যাবার চেষ্টা, বাধা দেয়, এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, নঞর্থক চিন্তার অস্বাভাবিক বহির্প্রকাশ।

বউরগুইগঁ এবং ওয়াটসনের মতে (১৯৮৭), এট্যাচ্মেন্ট্ সংক্রান্ত তিন ধরনের সমস্যা দেখা দেয় যা মানসিক সমস্যা, ব্যবহারিক সমস্যা, চিন্তন প্রক্রিয়ায় সমস্যা এবং ডিভেলপমেন্ট ডিলে রূপে প্রকাশ পায়। সেগুলি নিম্নরূপ–

- ভয়গ্রস্ত শিশু, সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত ভয় যার ফলে নতুন সম্পর্ক তৈরিতে বিশ্বাস ও আশা থাকে না।
- সঠিকভাবে সান্নিধ্য পায় নি এমন শিশু – মূল ব্যক্তির সঙ্গে সান্নিধ্য বাধা প্রাপ্ত হয়েছে, কিংবা সঠিকভাবে হয় নি ফলে নতুন সম্পর্ক তৈরিতে অসুবিধা।
- কোন সান্নিধ্য পায় নি এমন শিশু – সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু যে মৌলিক সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত।

যে সব শিশুর এট্যাচ্মেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা যায়–

- সুস্থ সম্পর্ক তৈরি করার সমস্যা
- স্নেহ প্রদর্শনে সমস্যা।
- অপরিণত আত্মকেন্দ্রিক ব্যবহার,
- ভালো-মন্দ বিচার বোধে সমস্যা,
- মানসিক দূরত্ব রাখে

পিতামাতার ভূমিকা

শিশুর চাহিদা অনেকে মিটাতে পারলেও পিতামাতার সান্নিধ্য শিশুর সার্বিক বিকাশের সহায়ক (ডেনিয়েল ও অন্যান্য ১৯৯৯)।

বাউন্ড্রিঙ্ড (১৯৭২) এর মতে, পিতামাতার লালন পালনের দু-টি দিক রয়েছে – শিশুর চাহিদার প্রতি পিতামাতার নজর ও সদর্থক প্রতিক্রিয়া এবং পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাঁর মতে পিতামাতার আচরণ চার ধরনের হতে পারে (মেক্কোবাই এবং মার্টিন ১৯৮৩ – ডেনিয়েল ও অন্যান্য ১৯৯৯)।

চাহিদা (ডিমান্ডিংনেশ)

প্রতিক্রিয়া (রেসপনসিভনেশ্)		**হাই**	**লো**
	হাই	কর্তৃত্বপরায়ণ (অথরিটেটিভ্)	প্রশ্রয়দানকারী (ইনডালজেন্ট্)
	লো	আদেশ মান্য করা (অথরিটেরইয়্যান্)	উদাসীন (ইনডিফারেন্ট)

স্টেইনবার্গ (ডেনিয়েল ও অন্যান্য ১৯৯০) নিম্নলিখিতভাবে চার ধরনের ব্যবহারের সারাংশ করেছেন–

কর্তৃত্বপরায়ণ (অথরিটেটিভ্) ঃ উষ্ণ কিন্তু কঠোর। ব্যবহারের মাপকাঠি ঠিক করে দেয় যা শিশুর বয়স ও বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বাতন্ত্র্যতাকে মূল্য দেওয়া হয় কিন্তু শিশুর ব্যবহারের দায়ভারও গ্রহণ করা হয়। যুক্তিযুক্ত শৃঙ্খলা যা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে স্থির করা হয়। এরুপ তত্ত্বাবধানের ফলে শিশু মানসিকভাবে দৃঢ় হয়, উষ্ণ, স্নেহপরায়ণ, সৃজনশীল, দায়িত্বপরায়ণ এবং আত্মবিশ্বাসী হয়, স্কুলে সফল হয়।

আদেশ মান্য করা (অথরিটেরইয়্যান্) ঃ আনুগত্য ও আদেশ পালনের উপর জোর দেয়। শৃঙ্খলা দণ্ডবিধি যুক্ত, বাধ্যতামূলক কোন আলোচনা করা হয় না। কোন প্রশ্ন না করে শিশু আইন মেনে নেবে এমন আশা করা হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। ব্যক্তি হিসাবে তাদের বিকাশকে মর্যাদা দেওয়া হয় না। যে সকল শিশুরা খুবই নির্ভরশীল, নিষ্ক্রিয়, সামাজিক দিক থেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, জ্ঞান আহরণে উৎসাহ থাকে না তাদের এট্যাচ্মেন্ট এই ধরনের।

ইনডালজেন্ট্ ঃ সব ব্যবহারই মেনে নেওয়া হয়। শৃঙ্খলা বাধ্যতামূলক নয়। শিশুর স্বাধীনতা অবাধ। নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যে সব শিশু পরিণত হয় না, দায়িত্বজ্ঞানহীন, নেতৃত্বের গুণাবলীহীন হয় যারা এরূপ ব্যবহার পেয়েছে।

উদাসীন (ইনডিফারেন্ট) ঃ পিতামাতার ভূমিকা অবহেলা সম্পন্ন। জীবন ও শৃঙ্খলা কেবল বড়দের ঘিরে। শিশুর ইচ্ছা, মতামত গুরুত্ব পায় না। শিশুর কাজকর্মের প্রতি নজর থাকে না। শিশুর অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে এধরনের ব্যবহারের জড়িত।

প্রকৃতপক্ষে লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতামাতার কম সান্নিধ্য, বিরুদ্ধ আচরণ, অঙ্গীকার রক্ষা হয়নি এবং খারাপ সম্পর্ক শিশুর সামাজিক ও মানসিক বিকাশ এবং শিক্ষা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যারূপে দেখা দেয় (স্কেফার ১৯৯৬, স্টেইনবার্গ ১৯৯৩ – ডেনিয়েল ও অন্যান্য ১৯৯৯)।

কুপারের মতে (১৯৮৫) স্বাতন্ত্র্যতা সত্ত্বেও সব সংস্কৃতির সব শিশুর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রযোজ্য–

শারীরিক যত্ন

- স্নেহ-শারীরিক ও মানসিক ঘনিষ্ঠতা
- নিরাপত্তা, রুটিন, যত্নের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা
- উৎসাহ ও প্রশংসার মাধ্যমে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশে সাহায্য
- তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ
- বয়স অনুসারে দায়িত্ব
- বয়স অনুসারে স্বাধীনতা – যাতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে, সিদ্ধান্তের প্রভাব বুঝতে পারে। ডেনিয়েল (১৯৯৯) এর মতে অসংগত লালন পালনের দিকগুলি হল–

মানসিক বিকাশ সংক্রান্ত সমস্যা

- শিশুর ইচ্ছা, চাহিদা ও উৎসাহের প্রতি উদাসীন মনোভাব
- স্নেহের অভাব

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা

- কঠোর শারীরিক শাস্তি
- কঠোর নিয়ন্ত্রণ
- চরম, প্রশ্নাতীত শৃঙ্খলা

পারিবারিক সম্পর্কে সমস্যা

- পিতামাতার মধ্যে খারাপ সম্পর্ক,
- সবসময় যুযুদ্ধমান অবস্থা,
- মানসিক চাপ যুক্ত, বিরক্তিকর পরিবেশ

তুল্যমূল্য বিচার

- খারাপ মনোভাব আরোপিত করা
- খারাপ বলে চিহ্নিত করা
- ক্ষিপ্ত হওয়া এবং ত্যাগ
- সদর্থক চিন্তাকে অবদমিত করা

পরিবারের ভূমিকা

পরিবার যে কোন সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেখানে সামাজিকীকরণ হয়। শিশু সামাজিক নিয়ম কানুন, মূল্যবোধ এবং পরিবারের ব্যাবস্থাপনার মধ্যে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের শিক্ষা পায়। পরিবারের মধ্যে শিশুর সামাজিকীকরণের বিভিন্ন দিক রয়েছে–

নর্মেটিভ্ ঃ (যেখানে সমাজের মূল কানুন শিশুর মধ্যে বর্তায়)।

কগনেটিভ্ ঃ শিশু আচার আচরণ ও জ্ঞান আহরণ করে যা পরবর্তীকালে প্রাপ্তবয়স্কের আচরণে প্রকাশ পায়।

ক্রিয়েটিভ্ ঃ সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটে, নতুন পরিস্থিতিতে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

মনস্তাত্ত্বিক ঃ পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক ভবিষ্যতের সঙ্গীর, সন্তান ও অন্যাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক।

এটি সর্বজনগ্রাহ্য সত্য যে, পরিবারের মধ্যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে শিশুর সংযোগ স্থাপনে সহায়ক। এবং তা সঠিক না হলে বৃহত্তর সমাজে তার খারাপ প্রভাব পড়ে।

চেন্নাবাসভান্ন ও অন্যান্যদের মতে শিশুর সঠিক বিকাশের জন্য পরিবারের নিম্নলিখিত ভূমিকা রয়েছে–

ক) যত্ন প্রদান (লালন পালন)

এই লালন পালন বা যত্ন অসহায় নলজাতক থেকে শুরু করে কিশোর বয়স পর্যন্ত হতে পারে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মিটানোর জন্য ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা এবং নিরাপত্তা দরকার হয়। সঠিক লালন পালনের জন্য শিশুর বিভিন্ন বয়সের চাহিদা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং শিশুকে পরিচালনা করার দক্ষতা থাকা দরকার। মনে রাখতে হবে নয় মাসের শিশু এবং তিন বছরের শিশুর চাহিদা ভিন্ন এবং সুন্দর পরিবার শিশুর চাহিদা অনুসারে নিজেদের পরিবর্তন করে।

সাধারণত, মা মূলত শিশুর লালন পালনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, বিশেষ করে ছোট্ট শিশুর ক্ষেত্রে। যদিও শিশুর যত্ন বা লালন পালন পারিবারিক ব্যাপার এবং পরিবার এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মায়ের শিশু লালন পালন করার ক্ষমতা তার বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক, প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক, অন্য শিশুদের চাহিদা দ্বারা প্রভাবিত। বাবাও পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। মায়েদের লালন পালন ক্ষমতা মূলত পরিবারের লোকজনের সহায়তার উপর নির্ভরশীল।

খ) সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা

সুন্দর, সুসংহত ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ছেলে মেয়ের ভূমিকা কীরকম হবে তা যেন সে পরিবারে পিতা-মাতা ও সন্তানদের সুসম্পর্কের মধ্যে দেখার সুযোগ পায়। পরিবারের সদস্যরা তাদের পরিপূরক ভূমিকা, নেতৃত্ব, ছেলে-মেয়ে কাজের ধরন ইত্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে বিনিময়, নিয়মের প্রতি আনুগত্য এবং একসাথে বসবাসের মডেল বা আদর্শ রূপরেখা তুলে ধরে।

সেই জন্য পিতা-মাতার মধ্যে নির্ঝঞ্ঝাট সুসম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। যদি পিতা-মাতা দম্পতি হিসাবে একটি একক রূপে নিজেদের উপস্থাপন করতে পারে তবে শিশু প্রাপ্তবয়স্কদের একটি আদর্শ রূপ বা মডেল দেখতে পায়। পিতা-মাতার মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন, বিভিন্ন জেনারেশানের মধ্যে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ শিশুকে মানসিক নিরাপত্তা দেয়। আর তা না হলে শিশু দ্বিধাগ্রস্ত হয় যা সুন্দর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়।

গ) পরিবার-সমাজ ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম অংশ

পরিবারই হল শিশুর কাছে প্রথম সামাজিক ব্যবস্থা যা সে দেখতে পায় এবং যেখানে সে বড় হয়। সেখানে সে পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এবং তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে পারে। পারিবারিক মূল্যবোধ, প্রশংসা ও শাস্তি, আর্থিক লেনদেন, বিনিময়, একত্রে বসবাস, কর্তৃত্বের মূল্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সে জানতে পারে।

ঘ) পরিবার ও সংস্কৃতি

পরিবারের মধ্যে সে কয়েকটি বিষয় যেমন – খাদ্যের পছন্দ, পোশাক, খেলাধূলা, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা, গান-বাজনা ও অন্যান্য বৌদ্ধিক বিকাশের অনুপ্রেরণা পায়। শিশুর প্রথম শিক্ষক হল তার বাবা-মা, বাবা-মা না থাকলে শিশুর দায়িত্বে থাকা অন্য কেউ। এবং শিশু তার প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার থেকেই পায়। তার বৌদ্ধিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ভিত্তি হল পরিবার।

এই চারটি ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অনুসন্ধান করলে পরিবার, পিতামাতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। পরিবারে স্থায়িত্ব এবং সুসম্পর্কই শিশুর বিকাশের পক্ষে আদর্শ।

বন্ধুগোষ্ঠীর ভূমিকা

শৈশব অবস্থায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কও পরিবর্তন হয় (স্মিথ এবং কোই ১৯৯১)।

বয়ঃগোষ্ঠী	সম্পর্ক
৬ বছর ও তার কম বয়স	প্রতিবেশী অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে অবলীলাক্রমে খেলা করে।
৭-৮ বছর	সাধারণত যারা কাছে থাকে এবং একই কাজে যুক্ত তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব।
৯-১০ বছর	যাদের সঙ্গে মত বিনিময় করা যাবে এমন বন্ধু খোঁজ করে।
১১-১২ বছর	বন্ধুত্ব ক্রমশ সমঝোতা, ভাব বিনিময় ও পরস্পরকে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

গটম্যান ও পার্কারের মতে (১৯৮৭) বন্ধুত্বের ছয়টি ভূমিকা রয়েছে

- সাহচর্য
- উদ্দীপনা
- শারীরিক সহায়তা
- ইগো সাপোর্ট
- সামাজিক তুলনা
- ঘনিষ্ঠতা এবং স্নেহ

কোই ও ডজের মতে (১৯৮৩) শিশুদের নিজেদের দ্বারা বিশ্লেষণ করা পাঁচটি বিষয় হল–

জনপ্রিয় শিশুরা সহযোগিতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব দেয়। গোষ্ঠীর কাজে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ক্ষমতা, বন্ধুত্ব পরায়ণ মনোভাব, দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া এবং খোলামনে মিটমাট করার প্রবণতা তাদের জনপ্রিয় করে।

বিতর্কিত শিশুদের কিছুটা নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু তারা হিংসাত্মক, বিচ্ছিন্নতাকামী বা ধংসাত্মক।

প্রত্যাখ্যাত শিশু ধংসাত্মক, অসহযোগী, নেতৃত্বের ক্ষমতাহীন। তারা শর্তসাপেক্ষে গোষ্ঠীকর্মে যোগ দেয় এবং গোষ্ঠীকর্মের সাথে একমত নাও হতে পারে। তারা নিজেদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। স্বভাবতই তারা বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না।

অবহেলিত শিশু কলহপ্রিয় বা আক্রমণাত্মক নয়। তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও নেতৃত্বের অভাব দেখা যায়।

সাধারণ শিশুরা বন্ধুত্ব করতে পারে, খুব বেশি আক্রমণাত্মক কিংবা চুপচাপ থাকে না।

বুটারের এবং রুটারের মতে (১৯৯৩) বন্ধুত্বের সম্পর্ক মানব জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ–

- বন্ধুদ্বারা প্রত্যাখ্যান পীড়াদায়ক
- বন্ধু না থাকলে সামাজিক সহায়তা নেই যা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার প্রতিরোধক
- বন্ধু না থাকলে স্কুলের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং ব্যক্তিজীবনের উন্নতি ব্যাহত হয়।
- বন্ধুদ্বারা প্রত্যাখ্যান আত্মমর্যাদা ও আত্মক্ষমতা হ্রাস করে।
- যে ব্যবহার বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটায় বিশেষ করে কলহ বা আক্রমণাত্মক মনোভাব পরবর্তীকালে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

২.৫ শিশু উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প

জাতীয় নীতি

ন্যাশন্যাল্ পলিসি ফর চিলড্রেন ১৯৭৪	এই নীতির মাধ্যমে জন্মের পূর্বে, জন্মের পরে ও পরবর্তীকালে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক তথা সার্বিক বিকাশের জন্য রাজ্যকে সুসংহত পরিষেবা প্রদানের কথা বলা হয়।
শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ১৯৮৬ এবং জাতীয় কর্মসূচি	শিশুদের জন্য যত্ন এবং শিক্ষার (ই.সি.সি.ই.) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুদের সার্বিক বিকাশ, পরবর্তী জীবনের বুনিয়াদ গঠনের জন্য ই.সি.সি.ই. খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে ধরা হয়। এবং কর্মরত মায়েদের কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (২০০২)	রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া সমন্বয় এবং পরিবার তথা জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যের যত্ন সংক্রান্ত ব্যবহারিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে।
ন্যাশনাল্ চার্টার ফর চিলড্রেন ২০০৩	২০০৪ সালে শিশুদের জন্য জাতীয় ইস্তাহার গৃহীত হয়। শিশুরা যাতে সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শৈশব পায় তা সুনিশ্চিত করাই হল এর উদ্দেশ্য। পরিবার ও জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা যাতে শিশুরা শোষণ, বঞ্চনার শিকার না হয়। এই সনদে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয় রয়েছে- ● জীবিত থাকা এবং স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করা ● অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সব ধরনের শোষণ, নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা ● মেয়ে শিশুদের সুরক্ষা ● প্রান্তিক অনগ্রসর শ্রেণির শিশুদের সুরক্ষা ● শিশুদের উপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ জাতীয় সনদ, শিশুদের প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতার ইঙ্গিত বহন করে। ১৯৭৪ সালের ন্যাশন্যাল, পলিসি ফর চিলড্রেন এখনো নীতি সংক্রান্ত মূল অঙ্গীকার। পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে ন্যাশন্যাল প্ল্যান অব্ একশন্ গৃহীত হয়।
কমিশন্ ফর দ্যা প্রোটেকশন্ অব চাইল্ড্	এর ফলে শিশুর অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতীয় স্তরে ও রাজ্য স্তরে কমিশন গঠন করা হয়। শিশুর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হলে, অত্যাচার বা নির্যাতন করা হলে শীঘ্র বিচারের ব্যবস্থা রয়েছে। কমিশন গঠনের জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে রাজ্য স্তরে কমিশনার নিয়োগ করতে হবে। জাতীয় ও রাজ্য স্তরের কমিশনার তাদের গোচরে আনা সমস্ত বিষয় তদারকি করবেন এবং সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ন্যাশন্যাল্ প্ল্যান অব একশন ফর চিলড্রেন ২০০৫	শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি একশন্ প্ল্যানে রাখা হয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে শিশুদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার বেশ কিছু প্রয়াস রয়েছে। যে সকল নীতির উপর ভিত্তি করে এই ন্যাশন্যাল্ প্ল্যান অব একশন্ তা হল– ● শিশুকে সম্পদ হিসাবে দেখা এবং তার মানবাধিকার রয়েছে, ● লিঙ্গ, শ্রেণি, জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করা এবং আইনগতভাবে সাম্য সুনিশ্চিত করা, ● নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনগ্রসর, হত দরিদ্র এবং যারা পরিষেবার সুযোগ পায় না তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া, ● বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে শিশুরা বড় হয়, এবং সেই প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে শিশুর প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে হবে। ন্যাশন্যাল্ প্ল্যান্ অব একশন্ ফর চিলড্রেন (২০০৫) কর্মসূচি রূপায়ণ ও অর্থ বরাদ্দ করার ব্যাপারে মোট ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করেছে। বিষয়গুলি হল– ● শিশুমৃত্যু কমিয়ে আনা, ● মাতৃমৃত্যু কমিয়ে আনা, ● শিশুদের অপুষ্টি দূর করা, ● সব শিশুর জন্ম নথিভুক্তকরণ, ● সব শিশুর জন্য প্রাক্ শৈশব যত্ন, উপযুক্ত শিক্ষা, ● কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধ করা, কন্যা শিশু সন্তান হত্যা বন্ধ করা, বাল্য বিবাহ রদ এবং কন্যা সন্তানদের বাঁচা, তাদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, ● গ্রাম এবং শহর উভয় ক্ষেত্রে জল ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নত করা, ● সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের অধিকার সুনিশ্চিত করা, ● সমস্ত ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও অবহেলার হাত থেকে সামাজিক ও আইনি সুরক্ষা, ● শিশু শ্রম সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করা, ● শিশুর অধিকার সুনিশ্চিত করতে নীতি ও কর্মসূচির মনিটরিং, পর্যালোচনা এবং সংশোধন, ● শিশুদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। মিলেনিয়াম ডিভেলপমেন্ট গোল অর্জনের লক্ষ্যে ন্যাশন্যাল্ প্ল্যান অব একশন্ ফর চিলড্রেন (২০০৫) রূপায়ণের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়েছে।

দ্যা ন্যাশন্যাল্ চিলড্রেনস ফান্ড্	১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষ্যে চেরিটেবল্ এন্ডোমেন্ট্ ফান্ড্ এক্ট, ১৮৯০ এর অধীনে দ্যা ন্যাশন্যাল্ চিলড্রেন্স ফান্ড্ গঠন করা হয়েছে। এই ফান্ড্ থেকে শিশুদের পুনর্বাসন সহ শিশু কল্যাণে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
দ্যা ন্যাশন্যাল্ কমন্ মিনিমাম্ প্রোগ্রাম	এখানে স্পষ্টভাবেই বলা আছে সরকার শিশুর অধিকার রক্ষা করবে, শিশুশ্রম রদ করবে, শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং কন্যা সন্তানদের যত্নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ন্যাশন্যাল্ কমন্ মিনিমাম্ প্রোগামের মূল বিষয়গুলি হল– ● সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য অঙ্গীকার, ● সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং ঐক্য সুনিশ্চিত করা, ● কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করা, ● দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য সরকার, ● দায়িত্বশীল সক্রিয় প্রশাসন। যদিও এন.সি.এম.পি. তে শিশুদের জন্য সরকারের সমস্ত অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করা হয় নি, তবু শিশুর অধিকার সুরক্ষা করার মূল বিষয়টি সরকার দেখবে। এবং এই নীতি বাস্তবে রূপদানের জন্য ২০০৫ সালের ন্যাশন্যাল্ প্ল্যান অব একশনে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশল সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং অঙ্গীকার

১৯৯২ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশুর অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনে শিশু সুরক্ষা, এবং তাদের উন্নয়নের কাজে ব্রতী হওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল। ১৯৯০ সালে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে ঘোষিত শিশুকে বাঁচিয়ে রাখা, সুরক্ষা এবং তাদের বিকাশ সংক্রান্ত প্রস্তাব ভারত গ্রহণ করে পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে খসড়ার পরিবর্তনযোগ্য অংশগুলি সংশোধন করে শিশুদের যুদ্ধবিগ্রহ, শিশু পাচার, যৌগ ব্যবসা এবং পর্নগ্রাফির হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। সহস্রাব্দর উন্নয়ন লক্ষ্য (মিলেনিয়াম ডিভেলপ্মেন্ট গোল) গ্রহণ করে ভারত পুনরায় তার অঙ্গীকার প্রকাশ করেছে। ২০০২ সালে সার্ক সম্মেলনে মহিলা ও শিশুদের পাচার ও যৌন ব্যবসায় নিয়োগের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাবনায় স্বাক্ষর করে। ২০০১-২০১০ এই দশকটি সার্কের শিশুর অধিকার দশক বলে চিহ্নিত করা হয়। এবং ১৯৯৬ সালে রাউলপিণ্ডি প্রস্তাবনায় তা স্থির করা হয়েছিল।

কর্মসূচি–

সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প (আই.সি.ডি.এস.)

১৯৭৫ সালে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প শুরু হয়–

- ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের, গর্ভবতী ও ছোট শিশু আছে এমন মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি।
- শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের বুনিয়াদ তৈরি।
- অসুখ, অপুষ্টি, শিশুমৃত্যু ও স্কুল ড্রপ আউটের প্রবণতা কমিয়ে আনা।
- বিভিন্ন নীতির সমন্বয় এবং কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে শিশু উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।
- পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে মায়েদের সক্ষম করা যাতে তারা শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের এবং গর্ভবতী ও ছোট শিশু আছে এমন মায়েদের জন্য নিম্নলিখিত পরিষেবা দেওয়া হল–

১) পরিপূরক পুষ্টি,

২) টীকাকরণ

৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষা

৪) রেফারেল সার্ভিসেস

৫) প্রাক-প্রাথমিক, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা

৬) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

এই কেন্দ্রীয় সবকারের একটি প্রকল্প এবং রাজ্য সরকারের মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে। কেন্দ্র, পরিপূরক পুষ্টি বাদে অন্য সমস্ত ব্যয় বহন করে, আর পরিপূরক পুষ্টির খরচ রাজ্য সরকার বহন করে। ২০০৫-০৬ সাল থেকে পরিপূরক পুষ্টির জন্য প্রকৃত ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বা নিয়ম অনুসারে ব্যয়ের ৫০ শতাংশ যা সর্বনিম্ন – সেই পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র দিচ্ছে।

আর্থিক কারণে দশম পরিকল্পনায় চালু ৫৬৬২ টি প্রকল্প বাদে অন্য কোন নতুন প্রকল্প শুরু করার প্রস্তাব নেই। যদিও ২০০৫-০৬ সালে অতিরিক্ত ৪৬৬টি প্রকল্প এবং ১,৮৮,১৬৮ টি অঙ্গান ওয়াড়ি কেন্দ্র চালু হয়েছে। ৩১.১২.২০০৫ তারিখে দেখা যাচ্ছে ৫৬৫৩টি প্রকল্প এবং ৭৪৫,৯৪৩টি অঙ্গান ওয়াড়ি কেন্দ্র চালু রয়েছে। ৩১.৩.২০০৬ তারিখে মোট উপভোক্তার সংখ্যা ৫৬৮.৪০ লক্ষ যার মধ্যে রয়েছে ৪৭৪.৫২ লক্ষ শিশু (০-৬ বছর) এবং ৯৩.৮৮ লক্ষ গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, যা ৩১.৩.২০০২ তারিখে ছিল ৩৭৫.০৯ লক্ষ (৩১৫.০৩ লক্ষ শিশু এবং ৬০.০৬ লক্ষ মা)।

রাজীব গান্ধী ন্যাশন্যাল্ ক্রেস স্কীম্ ফর দ্যা চিলড্রন অব ওয়ার্কিং এলিং মাদারস্

২০০৬ সালের ১ লা জানুয়ারী প্রকল্পটি শুরু হয়। ন্যাশনাল্ ক্রেস, ফান্ড্ এবং কর্মরত ও দুস্থ মায়ের সন্তানদের জন্য ক্রেস্ পরিষেবা দুটি একত্রিত করে এই প্রকল্প। এই প্রকল্প রাষ্ট্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ড এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ও ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সংঘ এই দুটি জাতীয় স্তরের বে-সরকারি সংস্থার মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ০-৬ বছরের শিশুদের জন্য পরিপূরক পুষ্টি, জরুরী ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া হয়। শিশুপ্রতি খরচ ১.০৫ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২.০৮ টাকা। এবং কেন্দ্রে ২৫টি শিশু মাসে ২৬দিন এই পরিষেবা পাবে। বি পি এল পরিবারকে মাসে ২০ টাকা এবং অন্যদের মাসে ৬০ টাকা দিতে হবে।

সোস্যাল্ ডিফেন্স সার্ভিস প্রদানের জন্য বে-সরকারি সংস্থাকে সহায়তা

এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা হয় যাতে তার নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রচলিত প্রকল্পের বাইরে নতুন ধরনের প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারে। উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ছাড়াও নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করার প্রকল্পও অনুমোদন করা হয়।

ফুটপাতে বসবাসকারী শিশুদের জন্য সুসংহত প্রকল্প

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল অসহায় শিশুদের ফুটপাতের জীবন থেকে সরিয়ে আনতে সাহায্য করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ফুটপাতবাসী শিশুদের বাসস্থান, পুষ্টি, স্বাস্থ্যের যত্ন, শিক্ষা এবং বিনোদন ইত্যাদি পরিষেবা দেওয়া হয় যাতে তারা শোষণের শিকার এমন শিশু এই কর্মসূচির লক্ষ্যদল। এই প্রকল্পের অধীনে যে ধরনের কর্মসূচি রয়েছে তা হল–

- শহর এলাকায় সমীক্ষা
- বর্তমান কি পরিষেবা রয়েছে তা নথিবদ্ধ করা এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ
- কাউন্সেলিং, গাইডেন্স এবং রেফারেল সার্ভিসেস
- শিশুকে ২৪ ঘণ্টা রাখা যায় এমন স্থান
- প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা
- তাদের পরিবারের সঙ্গে শিশুদের পুনরায় সুন্দর সম্পর্ক তৈরি, অসহায়দের হোম, হোস্টেল বা আবাসিক স্কুলে রাখার ব্যবস্থা।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
- স্বাস্থ্য পরিষেবা, মাদকদ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা কমিয়ে আনা, এইচ.আই.ভি. এডস্ এর হাত থেকে রক্ষা।
- সক্ষমতা বৃদ্ধি, সচেতনতা এবং পরামর্শদান

চাইল্ড লাইন সার্ভিস

চাইল্ড লাইনের টোল ফ্রী নম্বর হল ১০৯৮ এবং এই নম্বরে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়া হয়। যে সকল শিশুরা সমস্যা সঙ্কুল তারা বা তাদের অভিভাবক কথা বলতে পারে। বর্তমানে চাইল্ড্ লাইন ৭৩টি শহরে কাজ করছে। চাইল্ড্ লাইনের মূল উদ্দেশ্য হল-

১। শিশুর জরুরী প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট পরিষেবার জন্য তাকে পথ প্রদর্শন করা;

২। সরকারি এবং বে-সরকারি সংস্থা যারা শিশুর যত্ন ও সুরক্ষার কাজে লিপ্ত তাদের একটি ফোরাম্ বা মঞ্চ তৈরি করা;

৩। হাসপাতাল, চিকিৎসক, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশনকে শিশুর চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন করা;

৪। শিশু সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা:

৫। সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সমাজ বা জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রোগাম ফর্ জুভেনাইল জাস্টিস্

সরকার এই স্কিম্ চালু করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল–

১। রাজ্য সরকারকে জুভেনাইল জাস্টিস্ অ্যাক্ট বর্ণিত পরিকাঠামো ও পরিষেবা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা;

২। জুভেনাইল জাস্টিস্ পরিষেবার ন্যূনতম গুণগত মান বজায় রাখা;

৩। সমাজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না এমন কিশোর অপরাধীদের পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত পরিষেবা প্রদান।

এই প্রকল্পের অধীনে নারী ও শিশু উন্নয়ণ মন্ত্রক রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলকে কিশোর অপরাধীদের যত্ন ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ৫০ শতাংশ আর্থিক অনুদান দেবে।

স্কিম্ ফর ওয়েলফেয়ার অব ওয়ার্কিং চিল্ড্রেন ইন নিড্ অব কেয়ার এবং প্রোটেকশন্

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কর্মরত শিশুদের জন্য প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান যাতে তারা শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরতে পারে এবং ভবিষ্যতের শোষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই প্রকল্প ২০০৪-০৫ সাল থেকে রূপায়িত হচ্ছে।

সেন্ট্রাল এডপশন্ রিসোর্স এজেন্সি এবং শিশু গৃহ প্রকল্প

এই এজেন্সি ১৯৯০ সালের ২০ জুন স্থাপিত হয়। ১৮.৩.১৯৯৯ তারিখে ১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন্ এক্ট অনুসারে স্বতন্ত্র্য সংস্থা রূপে রেজিস্টার্ড হয়। রাজ্য সরকারের সুপারিশ অনুসারে এই এজেন্সি অন্যান্য সংস্থাকে বিভিন্নদেশের মধ্যে শিশুদের দত্তক গ্রহণের (এডপশন্) ব্যাপারে সাহায্য করবে। এই এজেন্সি বিভিন্ন বিদেশি সংস্থাকেও সাহায্য করে। বর্তমানে সেন্ট্রাল এডপশন্ রিসোর্স এজেন্সি ৬৪টি

ভারতীয় সংস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি বিভাগ সহ ২৫টি দেশে আরো ১৫২টি এজেন্সির নাম নথিভুক্ত করেছে। সেন্ট্রাল এডপশন্ রেসোর্স এজেন্সির মূল লক্ষ্য হল ভারত সরকারের নিয়ম নীতি অনুসারে দেশে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিশুদের দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় তদারকি করা। সেণ্ট্রাল এডপশন্ রিসোর্স এসেন্সি আবার সরাসরি শিশুগৃহ প্রকল্প রূপায়িত করে।

ভারত সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক একটি প্রকল্প রূপায়ণ করছে যেখানে সেন্ট্রাল এডপশন্ রিসোর্স এজেন্সি বিভিন্ন সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থাকে দেশের মধ্যে শিশু দত্তক গ্রহণ বা এডিপশনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। বার্ষিক সর্বাধিক অনুদান ছয় লক্ষ টাকা।

ন্যাশন্যাল্ চাইল্ড্ লেবার প্রেজেক্টস্ (জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্প)

শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে জেলা স্তরে রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি বিশেষ বিদ্যালয় বা পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা পাবে। ঐ সব বিশেষ বিদ্যালয় বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে শিশু শ্রমিকদের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, পরিপূরক পুষ্টি পরিষেবা, বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। সমীক্ষায় চিহ্নিত শিশু শ্রমিকদের এইসব কেন্দ্রে ভর্তি করতে হবে এবং তারা নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিথা পাবে–

১। প্রথাগত বা প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা

২। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

৩। পরিপূরক পুষ্টি (প্রতিদিন শিশুপ্রতি ৫ টাকা হারে)

৪। বৃত্তি (প্রতিমাসে শিশুপ্রতি ১০০ টাকা)

৫। স্বাস্থ্য পরিষেবা (২০টি বিদ্যালয়ের জন্য একজন ডাক্তার)

২.৬ শিশু সুরক্ষা – সাংবিধানিক সুরক্ষা, শিশুর অধিকার

ডন ও ডোনেলের মতো শিশু সুরক্ষা হল – শিশুর সমস্ত অধিকার যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। এটি অন্যান্য অধিকার যেমন সুন্দর ভাবে বাঁচা, বিকাশ ও উন্নতির পরিপূরক।

তাঁদের মতে শিশু সুরক্ষা কথাটি আরো ব্যাপক এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয় নিহিত রয়েছে। শিশুদের যৌন ব্যবসার সঙ্গে আর্থিক বিষয় জড়িত। অন্যান্য বিষয় যেমন – স্কুলে এবং বাড়িতে নির্যাতন – দারিদ্র, সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রথার সঙ্গে জড়িত। শিশুপাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ। অশ্লীল চিত্র তৈরিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারত সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের মতে শিশু সুরক্ষা হল – শিশুর জীবনে ঘটতে পারে এমন যে কোন অনুমেয় বা প্রকৃত বিপদ বা ঝুঁকি থেকে শিশুকে রক্ষা করা। এটি প্রকৃতপক্ষে ঝুঁকি বা বিপদ লাঘব করা। সমস্ত শিশু যেন সামাজিক নিরাপত্তা পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। শিশুর অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে শিশু সুরক্ষাও জড়িত। শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে শিশুদের অন্য সব অধিকারই প্রভাবিত হবে। শিশু সুরক্ষা হল সব শিশুর সব অধিকারের সুরক্ষা। এটি অবশ্যই শিশুদের ক্ষমতা, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মরক্ষা এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত।

যে সব শিশুরা নির্যাতন, শোষণ ও অবহেলার শিকার তাদের নিম্নলিখিত ঝুঁকি থাকে–

- আয়ু কমতে পারে
- খারাপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা
- শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা
- পরবর্তীকালে সঠিকভাবে বাবা-মা র ভূমিকা পালন করতে পারে না।
- গৃহহীন, ভবঘুরে ইত্যাদি।

বিপরীত পক্ষে সঠিক শিশু সুরক্ষা শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশ ও আত্মবিশ্বাসের সহায়ক। সেক্ষেত্রে নির্যাতন বা শোষণের সুযোগ থাকে না। (ডন ও ডোনেল ২০০৪)

শিশু সুরক্ষা প্রত্যেক শিশুর অধিকার হলেও কিছু শিশু সমস্যার সম্মুখীন এবং তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, সরকার ঐ সব শিশুদের – সমস্যা সঙ্কুল পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত শিশু বলে চিহ্নিত করেছেন। সমস্যাগুলি নিম্নরূপ–

- গৃহহীন (ফুটপাতবাসী, স্থানান্তরিত বা বিতাড়িত)
- উদ্বাস্তু, অনুপ্রবেশকারী
- অনাথ, পরিত্যক্ত, অসহায়
- পিতামাতার যত্ন পায় না এমন শিশু
- শিশু শ্রমিক
- শিশু ভিক্ষুক
- বাল্য বিবাহের শিকার শিশু
- পাচার হওয়া শিশু
- শিশু যৌনকর্মী
- যৌনকর্মীর শিশু
- বিভিন্ন দ্বন্দ্ব বা সমস্যার দ্বারা প্রভাবিত শিশু
- প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত শিশু
- মাদক দ্রব্য, এইচ.আই.ভি. এডস্ ও অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত শিশু
- আদিবাসী, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর শিশু
- মেয়ে শিশু
- অপরাধের শিকার শিশু
- আইনের সমস্যায় জড়িত শিশু।

শিশু সুরক্ষা বিষয়টি বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের সব শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

● প্রায় ৩০টি দেশে ৩০০,০০০ শিশু সৈনিক এমন কি আট বছর বয়সের শিশুও রয়েছে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত।

● ১৯৯০ সাল থেকে কুড়ি লক্ষের বেশি শিশু যুদ্ধের ফলে মারা গেছে।

● আইনের কারণে বিশ্বে প্রায় ১০ লক্ষ শিশু কারাগারে বন্দী। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ১৫ লক্ষ শিশু ক্ষতিগ্রস্ত। ১৩০ লক্ষ শিশু এডস্ এর কারণে অনাথ।

● প্রায় ২৫ কোটি শিশু – শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করে এবং ১৮ কোটির বেশি বিভিন্ন ঝুঁকি সম্পন্ন কাজে যুক্ত।

● প্রায় ১২ লক্ষ শিশু প্রতি বছর পাচার হয়।

১৯৯৫ সালের হিসাব অনুসারে প্রায় ১০ লক্ষ শিশু (বিশেষ করে বালিকা) যৌন ব্যবসায় যুক্ত। এখন সংখ্যাটি অনেক বেশি হবে।

● ১৫ বছরের নীচে ৪ কোটি শিশু অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার এবং তাদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা দরকার।

হিসাব অনুসারে আফ্রিকায় বসবাসকারী প্রায় ১০-১৩ কোটি মহিলা এবং বালিকা যৌন নির্যাতনের শিকার।

সাংবিধানিক সুরক্ষা

শিশুদের জন্য বেশ কিছু সাংবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন–

১৪ নং ধারা – ভারতে কাউকে সাম্য ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১৫(৩) নং ধারা – কোন কিছুই নারী ও শিশুদের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে অন্তরায় হবে না।

২১ নং ধারা – আইনের শিকার না হলে কোন ব্যক্তি তার বেঁচে থাকা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না।

২১ এ ধারা – ৬ থেকে ১৪ বছরের সব শিশুকে বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতে হবে।

২৩ নং ধারা – ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা কোন বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য কাউকে পাচার করা যাবে না।

২৪ নং ধারা – ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে খনি বা অন্য ঝুঁকি সম্পন্ন কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

২৫-২৮ নং ধারা – মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পেশা নির্বাচন ও ধর্মীয় আচার আচরণে স্বাধীনতা।

৩৯ নং ধারা – কৈশোর যেন অপপ্রয়োগ না করা হয় .... অর্থনৈতিক চাহিদা থাকলেও নয়। তাদেরকে সমস্ত ধরনের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে সুন্দরভাবে বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।

৪৫ নং ধারা – ৬ বছর পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রাক শৈশবের যত্ন এবং শিক্ষা।

৪৬ নং ধারা – দুর্বল শ্রেণি বিশেষ করে তপঃজাতি ও তপঃউপজাতির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে ব্যবস্থা।

৪৭ নং ধারা – পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং জীবন ধারনের মান উন্নয়ন সংক্রান্ত।

৫১ নং ধারা – রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন কানুনের প্রতি আনুগত্য দেখাবে।

৫১ এ ধারা – পিতামাতা বা অভিভাবক ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

শিশুর অধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মেলন

বিশ্বের সমস্ত সমাজে শিশুরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আবার ঝুঁকি সম্পন্ন। সুতরাং তাদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টির গুরুত্ব বিচার করে শিশুর অধিকার সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়েছে। এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মেলনে নির্ধারিত, ১৯৮৯ সালে তৈরি করা শিশুর অধিকার এই সুরক্ষা সংক্রান্ত খসড়ার ভিত্তিতে প্রায় সমস্ত দেশ নিজেদের মতো করে শিশু সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সম্মেলনে শিশুর অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। ভারত সরকার ১৯৯২ সালে তা সংশোধন করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মেলনে গৃহীত শিশুর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি হল–

- ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে, বিবাহিত বা অবিবাহিত এমন কি তাদের সন্তান থাকলেও সবাইকে সমানভাবে দেখতে হবে।
- এই সম্মেলন তিনটি নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় – শিশুর স্বার্থ, সাম্য এবং শিশুর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্মান।
- শিশুর সুষম বিকাশের পরিবেশ তৈরিতে পরিবারের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
- রাষ্ট্র দেখবে যাতে সমাজে শিশুরা সঠিকভাবে সমমর্যাদা পায়।
- নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
- বাঁচা
- সুরক্ষা
- বিকাশ
- অংশগ্রহণ

বাঁচার অধিকারগুলি হল

- জীবনের অধিকার
- সুস্বাস্থ্যের অধিকার
- পুষ্টি

- সুন্দর জীবন ধারণের মান
- নাম ও জাতীয়তা

বিকাশের অধিকারগুলি হল

- শিক্ষার অধিকার
- প্রাক্ শৈশবের যত্ন
- সামাজিক সুরক্ষা
- বিশ্রাম, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চা

সুরক্ষার অধিকারগুলি হল

- শোষণ থেকে সুরক্ষা,
- নির্যাতন থেকে সুরক্ষা,
- অমানবিক বা অসম্মান জনক পরিস্থিতি থেকে সুরক্ষা,
- অবহেলা থেকে সুরক্ষা,
- জরুরী অবস্থা, যুদ্ধ বা প্রতিবন্ধী ইত্যাদি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা।

অংশগ্রহণের অধিকারগুলি হল

- শিশুর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্মান
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা
- তথ্য পাওয়ার অধিকার
- চিন্তা, মতামত প্রকাশ ও ধর্মীয় আচরণের অধিকার।

যদিও সুরক্ষার ধরন অনুসারে এই বিভাগ করা হয়েছে তবু বলা যায় সমস্ত অধিকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যা সহজে চোখে পড়ে না।

আবশ্যিক অধিকার (নাগরিক ও রাজনৈতিক) – যার মধ্যে রয়েছে বৈষম্য, শাস্তি, কিশোর অপরাধীর জন্য আলাদা বিচার ব্যবস্থা, জীবনের অধিকার, জাতীয়তার অধিকার, পরিবারে পুনরায় থাকার অধিকার, অধিকাংশ অধিকারই আবশ্যিক অধিকারের মধ্যে পড়ে তাই গুরুত্ব সহকারে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

বিকাশ বা প্রগতি সংক্রান্ত অধিকার – (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক) যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা পূর্বের অধিকারগুলির মধ্যে নেই এমন সব অধিকার।

শিশুর অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে –

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বাতাবরণে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়।

উৎস চাইল্ড্ প্রোটেকশন – এ হ্যান্ড বুক ফর টিচার্স, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার-২০০৬।

২.৭ শিশুদের নির্যাতন – ধরন, প্রভাব

শিশুদের নির্যাতন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংখ্যা ১৯৯৯ সালে শিশুদের নির্যাতন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেন–

শারীরিক নির্যাতন

শারীরিক নির্যাতন শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। যেমন – আগুনের ছেঁকা দেওয়া, আঘাত করা, ঘুষি মারা, লাথি মারা, ভয় দেখানো, প্রহার ইত্যাদি। অনেক সময় পিতামাতা বা পরিবারের লোকজন শিশুকে আঘাত করতে চান না। কিন্তু অধিক শাসনের অঙ্গ হিসাবে শারীরিক শাস্তি দিয়ে থাকেন, যা শিশু বয়সের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

যৌন নির্যাতন

শিশুর যৌন ব্যাপারে অনুপযুক্ত ব্যবহার। যেমন শিশুদের যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করা, শিশুকে দিয়ে বয়স্কদের যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করানো, যৌন মিলন, ধর্ষণ, ভাই-বোনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক, ছেলে-ছেলে যৌন সম্পর্ক, অশ্লীলভাবে দেহ অনাবৃত করা এবং অন্যান্য যৌন উপভোগ। শিশু যত্নের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এইভাবে যৌনতার দিক দিয়ে শিশুকে ব্যবহার করলে সেক্ষেত্রে শিশুদের অপব্যহার কথাটি ব্যবহার হয়। আর কোন অপরিচিত ব্যক্তি এই সব করলে তা যৌন নির্যাতন বলে ধরা হয় এবং তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং ফৌজদারী মামলা করা হয়।

মানসিক নির্যাতন

মানসিক নির্যাতনকে মৌখিক, মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ণ বলে ধরা হয়। পিতামাতা বা শিশুযত্নের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির ব্যবহার শিশুর ব্যবহার, চিন্তার জগৎ, মানসিক জগৎ, আবেগকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে এবং মানসিক ভয় দেখা দিতে পারে। তাঁরা যদি শিশুকে খুব শাস্তি দেন – যেমন অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা, চেয়ারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বেঁধে রাখা, বকা, বিরক্ত হওয়া ইত্যাদি। তাহলে শিশুর উপর খুবই প্রভাব পড়ে। তাছাড়া শিশুকে খারাপ ভাষায় গালাগালি দেওয়া, দোষারোপ করার প্রবণতা ইত্যাদিও তাকে স্বাভাবিক জীবন থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করে। অবহেলা শিশুর মৌলিক চাহিদা পুরণে ব্যর্থ হওয়া। অবহেলা-শারীরিক, মানসিক বা শিক্ষাগত হতে পারে। শারীরিক অবহেলা যেমন – উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য বা বস্ত্র, চিকিৎসা না দেওয়া, যত্ন না করা, ঠাণ্ডা বা গরমের হাত থেকে রক্ষা না করা। শিশুকে পরিত্যাগ করাও হতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলা – উপযুক্তভাবে শিক্ষা না দেওয়া, প্রয়োজন মতো বিশেষ শিক্ষা না দেওয়া। মনস্তাত্ত্বিক অবহেলা – সঙ্গ, আদর ভালোবাসা না দেওয়া, মদ পান বা নেশার সময় শিশুকে কাছে রাখা বা তাকে মদ পান করতে সাহায্য করা।

শিশু নির্যাতনের সম্বন্ধে গবেষণার বা অনুসন্ধান করার জন্য ২০০৭ সালে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক নিম্নলিখিত সংজ্ঞা ঠিক করেন–

শিশু নির্যাতন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, বোঝা যায় এমন যে কোন ধরনের নির্যাতন হতে পারে। এবং তা স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সংজ্ঞাগুলি নিম্নরূপ–

● মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক নির্যাতন, অবহেলা, নিষ্ঠুরতা, যৌন নির্যাতন ও মানসিক ভাবাবেগে আঘাত।

● যে কোন ধরনের কাজ যা শিশুকে স্বাভাবিক মানুষের মর্যাদা দেয় না, তাকে ছোট বা হেয় করে।

● তার মৌলিক চাহিদা থেকে তাকে বঞ্চিত করা যেমন – খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, আঘাতপ্রাপ্ত শিশুকে সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না করালে যা তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা স্থায়ী সমস্যা বা মৃত্যু হতে পারে।

● শারীরিক নির্যাতন হল শিশুকে শারীরিকভাবে আঘাত করা যার ফলে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এবং তা মারধর করা, লাথি, ঘুষি মারা ইত্যাদি হতে পারে।

● মানসিক ভাবাবেগে আঘাত বা মানসিক নির্যাতন – পিতামাতার ভূমিকা পালন করতে না পারা, পরিচর্যাকারী, আত্মীয় স্বজন তাদের ভূমিকা পালন করতে না পারলে শিশুর মানসিক বিকৃতি, ব্যবহারিক সমস্যা বা মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

● যৌন নির্যাতন হল যৌনতার দিক থেকে শিশুর প্রতি অনুপযুক্ত ব্যবহার করা। যেমন – শিশুদের যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করা, শিশুকে দিয়ে বয়স্কদের যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করানো, যৌন মিলন, ধর্ষণ, ভাই-বোনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক, অশ্লীলভাবে দেহ অনাবৃত করা, যৌনতা সংক্রান্ত পত্রিকা, চিত্র দেখানো ইত্যাদি। শিশু যত্নের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এইভাবে যৌনতার দিক দিয়ে শিশুকে ব্যবহার করলে সেক্ষেত্রে যৌন অপব্যবহার কথাটি ব্যবহার হয়।

● শিশুদের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত করার যে কোন কাজই শিশু অবহেলার অঙ্গ। অবহেলা যে কোন ধরনের যেমন – শারীরিক, মানসিক, শিক্ষা সংক্রান্ত, মনস্তাত্ত্বিক বা ভাবাবেগ সংক্রান্ত হতে পারে। শারীরিক অবহেলা যেমন – খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিচর্যা না দেওয়া। শিশুকে পরিত্যাগ করাও হতে পারে। শিক্ষার দিক থেকে অবহেলা যেমন – উপযুক্তভাবে শিক্ষার সুযোগ বা শিশুর প্রয়োজনে বিশেষ শিক্ষা না দেওয়া। মনস্তাত্ত্বিক অবহেলা – উপযুক্ত স্নেহ ভালোবাসা না দেওয়া।

শিশু নির্যাতনের ধরন ও চিহ্ন

ধরন	নির্যাতন	চিহ্ন
শারীরিক নির্যাতন--	প্রহার, চপেটাঘাত, ঠেলে ফেলে দেওয়া, লাথি মারা, কামড়ে দেওয়া, শ্বাস রোধ করা, কান মোড়া, সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া, গরম জল ঢালা এবং অন্যান্য কঠোর নির্যাতন।	পোড়ার ক্ষত, কামড়ানোর চিহ্ন, কাটা – থেঁতলানো, ভবঘুরে – ঘরে যেতে চায় না।
যৌন নির্যাতন-	শিশুর যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া-চুম্বন, বয়স্কদের যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করতে দেওয়া, শিশুকে পোশাক খুলতে বাধ্য করা, বাথরুম বা বিছানায় শিশুকে লক্ষ্য করা, শিশুর সামনে যৌন সংসর্গ, যৌনাঙ্গ প্রদর্শন, অশ্লীল গল্প বলা, অশ্লীল ছবি,	যৌন ব্যাপারে অস্বাভাবিক উৎসাহ, কু-কর্মে প্রবৃত্তি, নিজের যৌনাঙ্গ সম্বন্ধে অবহেলা, অতিরিক্ত উত্তেজনা- আক্রমণ, বিশেষ

ধরন	নির্যাতন	চিহ্ন
	পত্রিকা দেখানো। বাণিজ্যিক দিক থেকে শোষণ যেমন – শিশু যৌন কর্মী, শিশুদের যৌন পত্রিকা ইত্যাদি।	কোন ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্যকে ভয়।
মানসিক নির্যাতন-	উচ্চস্বরে বকাবকি করা, ভয় দেখানো, তর্জন-গর্জন, অপমান করা – অপরের খারাপ দিকের সঙ্গে তুলনা করা, এবং সে ভালো নয় বা খারাপ, অপদার্থ এরুপ গালাগালি করা। স্নেহ ভালোবাসার (চুম্বন, প্রশংসা, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি) অভাব, শিশুর সব কাজই ভুল এভাবে বলা, অবজ্ঞা করা বা প্রত্যক্ষাণ-শিশুর প্রতি নজর না দেওয়া, শ্রদ্ধা না করা, শাস্তি – অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা, চেয়ার করে রাখা, ভীতি প্রদর্শন, হিংসাত্মক কাজের সাক্ষী – শিশু অপরের হিংসাত্মক ব্যবহার দেখলে, শিশু বলে তাকে শোষণ করা, শিশু চুরির ভয়।	ঔদাস্য বা অনীহা, আক্রমণাত্মক, বিরুদ্ধাচরণ, মনোসংযোগে সমস্যা।
অবহেলা	শারীরিক অবহেলা – উপযুক্ত খাদ্য না দেওয়া, আবহাওয়া অনুসারে বস্ত্র না দেওয়া, যত্ন তদারকি না করা, নিরাপদ পরিষ্কার ঘর না দেওয়া, সঠিক চিকিৎসা না করানো। শিক্ষা সংক্রান্ত অবহেলা-সঠিক বয়সে শিশুকে স্কুলে ভর্তি না করা, তার প্রয়োজন মাফিক বিশেষ শিক্ষা না দেওয়া, স্কুল না যেতে সাহায্য করা ইত্যাদি। ভাবাবেগ জনিত অবহেলা-স্নেহ ভালোবাসা না দেওয়া, শিশুর সঙ্গে সময় না দেওয়া, প্রয়োজন মতো মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা না করা।	আবহাওয়া অনুসারে পোশাক না পরা, নোংরা থাকা, স্নান না করা, প্রচণ্ড ক্ষুধা, আপাত যত্ন পরিচর্যার অভাব।

শিশু নির্যাতনের প্রভাব

শারীরিক	ক্ষত বা আঘাত চিহ্ন, মৃত্যু, স্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা, বৌদ্ধিক বিকাশে সমস্যা।
ব্যবহারিক সমস্যা-	বিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা, কম বয়সে গর্ভসঞ্চার, আত্মহত্যার প্রবণতা, মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে অবনতি, শিশু নির্যাতন।
মানসিক-	আত্মবিশ্বাসের অভাব, অবসাদ, দুশ্চিন্তা, খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা, সুসম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা, নিজেকে আলাদা করা বা সরিয়ে নেওয়া, চরিত্র গঠনে সমস্যা।

উৎস চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ইনফরমেশন গেটওয়ে, ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিসেস।

ভারতে শিশু নির্যাতনের গতিপ্রকৃতি বা চিত্র

ভারতে শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ২০০৭ সালে নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের গবেষণা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য জানা গেছে–

১। প্রতি তিন জনের মধ্যে দু-জন শিশু শারীরিকভাবে নির্যাতিত।

২। নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এমন ১৩টি রাজ্যে ৬৯ শতাংশ নির্যাতিত শিশুর মধ্যে ৫৪.৬৮ শতাংশ বালক।

৩। প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি শিশু যে কোন ধরনের শারীরিক নির্যাতনের শিকার।

৪। বাড়িতে নির্যাতিত শিশুদের মধ্যে ৮৮.৬ শতাংশ বাবা-মায়ের দ্বারা নির্যাতিত।

৫। স্কুলে পড়া শিশুদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ শিশু (দুই তৃতীয়াংশ) শারীরিক শাস্তি পায়।

৬। স্কুলে শাস্তি পাওয়াদের মধ্যে ৬২ শতাংশই সরকারি ও মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলে।

৭। অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার এবং দিল্লিতে এমন ঘটনার সংখ্যা অনেক বেশি, এবং প্রায়ই ঘটে।

৮। অধিকাংশ শিশু কাউকে সে কথা জানায় না।

৯। ৫০.২ শতাংশ শিশু সপ্তাহে সাত দিন কাজ করে।

যৌন নির্যাতন

১। ৫৩.২২ শতাংশ শিশু নানা ধরনের যৌন নির্যাতনের শিকার।

২। অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার এবং দিল্লিতে ছেলে মেয়ে উভয়ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

৩। উত্তরদাতা শিশুদের মধ্যে ২১.৯০ শতাংশ মারাত্মক যৌন নির্যাতনের শিকার, ৫০.৭৬ শতাংশ অন্যান্য কিছু যৌন নির্যাতনের শিকার।

৪। উত্তরদাতা শিশুদের মধ্যে ৫.৬৯ শতাংশ শিশুর উপর বলাৎকার করা হয়েছে।

৫। আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার এবং দিল্লিতে এরূপ বলাৎকারের ঘটনা সবচেয়ে বেশি।

৬। ফুটপাতে বসবাসকারী, কর্মস্থলে ও প্রাতিষ্ঠানিক যত্নে বেড়ে ওঠা শিশুরাই সবচেয়ে বেশি বলাৎকারের শিকার।

৭। ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনকারী ব্যক্তি শিশুর পরিচিত যাকে সে বিশ্বাস করে, এবং যার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

৮। অধিকাংশ শিশু কাউকে সে সব কথা জানায় না।

মানসিক নির্যাতন এবং কন্যা সন্তানের অবহেলা

১। প্রতি মুহূর্তে শিশুরা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন।

২। প্রায় সমান সমান ছেলে মেয়ে এরূপ সমস্যায় পড়ে।

৩। ৮৩ শতাংশ ক্ষেত্রে বাবা-মায়েরাই নির্যাতন করে।

৪। ৪৮.৪ শতাংশ কন্যাসন্তানকে ছেলের মতো করে দেখা হয়।

শিশু পাচার

শিশু পাচার বন্ধ করতে এবং পাচারকারীদের শাস্তি দিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে শিশু পাচার কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়। আন্তর্দেশীয় অপরাধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মেলনে (২০০০) নিম্নলিখিতভাবে পাচার কথাটির অর্থ নিরূপণ করা হয়।

১। শিশু পাচারকারী বলতে - শোষণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া, আশ্রয় দেওয়া, কাউকে ভয় দেখিয়ে কিংবা বল প্রয়োগে, প্রতারণা, ছলনা, বঞ্চনা, ক্ষমতার বা পদের অপপ্রয়োগ করে নিয়ে আসা, অর্থের বিনিময়ে কারো কাছ থেকে তার কোন পরিচিত ব্যক্তিকে নেওয়া ইত্যাদি বোঝায়। শোষণ বলতে দাসত্ব, দাসত্বের মতো কোন ব্যবহার, বাধ্যতামূলক শ্রম বা কাজ, যৌন নিপীড়ন, যৌনবৃত্তিতে নিয়োগ, গোলামী, অঙ্গচ্ছেদন ইত্যাদি বোঝায়।

২। উপরোক্ত অংশে আলোচিত পাচারকারীর অভিপ্রেত শোষণে - প্রতারিত ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণযোগ্য নয় বা অপ্রাসঙ্গিক।

৩। নিয়োগ, অপসারণ, স্থানান্তর, আশ্রয় দেওয়া অথবা শোষণের জন্য শিশুকে নেওয়া পাচার বলে গণ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে ১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অন্যান্য ব্যাপার নাও ঘটতে পারে।

৪। শিশু বলতে ১৮ বছরের নীচে যে কোন ব্যক্তি হতে পারে।

সেভ্ দ্যা চিল্ড্রেন এলায়েন্স এর দেওয়া পাচার কথাটির সংজ্ঞা নিম্নরূপ

নিয়োগ, দেশের মধ্যে বা অন্য দেশে স্থানান্তর, শিশু সহ অন্যকে আশ্রয় দেওয়া এবং তা ভয় দেখিয়ে বা চাতুরী করে, ঋণের কারণে ক্রীতদাসরূপে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে বা বিনা অর্থে নিযুক্ত করা, ক্রীতদাসের মতো যে কোন কাজ (গৃহস্থালী, যৌন বা সন্তানধারণ) করতে বাধ্য করা বোঝায়।

গ্লোবাল এলায়েন্স এগেনস্ট ট্রাফিক ইন উইম্যান নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেয়

যে কোন কাজ কিংবা কাজের প্রয়াস যা নিয়োগ, স্থানান্তর, ক্রয়, বিক্রয়, আশ্রয়, ভয় দেখিয়ে বা বল প্রয়োগ করতে বাধ্য করা এবং অর্থের বিনিময়ে বা বিনা পারিশ্রমিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রীতদাসের মতো যেখানে সে বসবাস করে না এমন জায়গায় কাজ করতে বাধ্য করানো।

শিশু পাচার বলতে – ভয় দেখিয়ে, বল প্রয়োগে, কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রতারণা করে শিশুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়াকে বোঝায়।

শিশু পাচারের পিছনে যে সকল শোষণমূলক মনোভাব থাকে তা নিম্নরূপ

শ্রমের মাধ্যমে শোষণ

শিল্প, খনি ও অন্যান্য ঝুঁকি সম্পন্ন কাজে যেমন - রাসায়নিক এবং পোকামাকড় দমনের ঔষধ নাড়াচড়া, বিপজ্জনক মেশিন ব্যবহার ইত্যাদিতে লাগানো হয়। তারা যাতে কাউকে বিপদের কথা না বলতে পারে। সেইজন্য সাধারণত তাদের দূরে রাখা হয়।

অনেকক্ষেত্রে ক্রীতদাসের কাজে লাগানো হয়। তাদের পরিবার সাধারণত অগ্রিম কিছু অর্থ পায় এবং এমনভাবে তা শিশুর বেতন থেকে কাটা হয় যে কোনদিন সে অর্থ পরিশোধ করতে পারবে না।

গৃহের কাজ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও) এর মতে গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত শিশুদের মধ্যে মেয়েরাই বেশি। শিক্ষিত ও উপযুক্ত চাকুরি দেওয়া হবে বলে বাবা-মা এবং শিশুকে বলা হয়। একবার পাচার হয়ে গেলে দেখা যায় পরিষেবা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। নিরাপত্তা, খাদ্য ও বসবাসের জন্য নিয়োগকারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় এবং কঠিন কঠোর পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

যৌন শোষণ

শিশু বিশেষকরে মেয়েদের এই কাজে বেশি ব্যবহার করা হয়। তাদের বেশ্যালয়ে, ম্যাসাজ পার্লারে, নগ্নভাবে ক্লাবে ব্যবহার কিংবা অশ্লীল চিত্র তৈরির কাজে লাগানো হয়। আই.এল.ও এর মতে ২০০০ সালে ১৮ লক্ষ শিশু যৌন শিল্পে শারীরিক, যৌন ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিপীড়িত হয়েছে।

সৈন্যদলে কাজে লাগানো

দেখা গেছে হাল আমলে প্রায় ৩০টি ক্ষেত্রে বিশ্বের নানা স্থানে শিশুদের যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ দারিদ্র্যতার কারণে যোগ দিতে বাধ্য হয় আবার কাউকে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের কাজ ভিন্ন ভিন্ন। বার্তাবাহক, কুলি, রাঁধুনী কিংবা অনেক সময় তাদের স্ত্রীর ভূমিকা পালন করতে হয়। যে সব শিশুরা

খুবই গরিব, অনাথ, বিতাড়িত, বাবা-মা থেকে আলাদা থাকে, শিক্ষার সুযোগ পায়নি তারাই বেশি করে এই কাজে যুক্ত।

বিবাহ

কনে হিসাবে মেয়েদের অনেক ক্ষেত্রে পাচার করা হয়। দারিদ্রতার ক্ষেত্রে মেয়েদের বোঝা হিসাবে দেখা হয় এবং বয়স্ক মানুষের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে পরিবারের লোকজন মুক্ত হতে চায়। অনেক সময় বাইরে কাজ করা ছেলেরা তাদের নিজেদের এলাকা থেকে মেয়েদের নিয়ে যায়। যেসব এলাকায় এইচ.আই.ভি. এডস্ এর সমস্যা রয়েছে সেখানে বয়স্ক পুরুষের কাছে কুমারী মেয়েদের চাহিদা খুব বেশি। পরিবারের লোকজনও তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চায় কারণ তারা মনে করে এর ফলে তাদের সন্তান এইচ.আই.ভি. এডস্ এর সংক্রমণ থেকে বাঁচবে। পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় বাল্যবিবাহ বিশেষ করে ১৯ বছরের কমে, খুবই বেশি যথাক্রমে - ৪৯ ও ৪০ শতাংশ।

অবৈধ দত্তক

দত্তক গ্রহণের ক্রম বর্ধমান প্রবণতা অবৈধভাবে শিশু পাচারকে উৎসাহ দিচ্ছে। অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশে শিশুকে বিক্রি করে দেয়, অনেক সময় শিশু চুরি হয় বা মৃত শিশু জন্মেছে বলে মা-কে বলা হয়।

খেলাধূলা

ছেলেদের উটের পিঠে চাপিয়ে খেলা করা হয়। এটি খুব লাভজনক ব্যবস্থা এবং ছোট শিশুদের ব্যবহার করা হয়। এই খেলা খুবই বিপজ্জনক এবং গভীর আঘাত বা মৃত্যুও হতে পারে। হেরে গেলে মালিক নৃশংসভাবে শিশুর উপর অত্যাচার করে যেমন - খেতে দেয় না, বেতন দেয় না তাছাড়া মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন রয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তি

ভিক্ষাবৃত্তি বা পথে জিনিস বিক্রির কাজে শিশুকে লাগাবার জন্য শিশুকে নিয়োগ বা পাচার করা হয়। অনেক সময় করুণা আদায় ও বেশি অর্থের লোভে শিশু ভিক্ষার্থীর অঙ্গাচ্ছেদন করা হয়।

অঙ্গ পাচার

অঙ্গ পাচারের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তবে এই চক্র খুঁজে বের করা কঠিন। এইরূপ ভয়ংকর কাজ সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত।

ভাবাবেগ বা মানসিক প্রভাব

লজ্জা অনুভব, নিজেকে দোষী মনে করে

নিজের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস কম

প্রতারিত বলে মনে করে

নিদ্রাহীনতা

হতাশাগ্রস্ত

অবসাদগ্রস্ত

মানসিক যন্ত্রণা লাঘবের জন্য মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আত্মহত্যার চেষ্টা

শারীরিক প্রভাব

ধর্ষণের শিকার হতে পারে

যৌন নিপীড়ণের শিকার

যৌনরোগ, এইচ.আই.ভি. বা এডস্ আক্রান্ত হতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

শিক্ষা ও সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পারিবারিক জীবন বলতে কিছু থাকে না।

শৈশব অবস্থায় কাজ করতে বাধ্য হয়।

স্কুলে যেতে পারে না, পরিবারের সহায়তা পায় না।

স্বাভাবিক সামাজিক জীবন থেকে দূর থাকে।

অদক্ষ ও অশিক্ষিতরূপেই বড় হয়।

নিজেদের স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে না।

বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না।

শিশুদের শোচনীয় অবস্থার মূল কারণগুলি হল

১। দারিদ্রতা

২। লিঙ্গ বৈষম্য - বালিকা ও মহিলাদের অসম সামাজিক পদমর্যাদা

৩। বিদ্যালয়ে কম নথিভুক্তি বা ভর্তি

৪। অযত্নে বেড়ে ওঠা শিশু (অনাথ)

৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যুদ্ধ

৬। সস্তা শিশু শ্রমিকের চাহিদা

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। চাইল্ড ডিভেলপমেন্ট ফর চাইল্ড কেয়ার এন্ড প্রোটেকশন ওয়ার্কারস - ব্রিগিড ডেনিয়েল, সেলী ওয়াসেল এবং রবি গিলিগাঁ, ১৯৯৯।

২। দ্যা ইন্ডিয়ান চাইল্ড - অ্যাপ্রোফাইল, নারী ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ, ভারত সরকার, ২০০২।

৩। ইন্ট্রিকেটরস্ অব্ মেন্টাল হেলথ - মাল্টি সেন্টার্ড আই.সি.এম.আর স্টাডি, ফেজ-২ - এস. এম. চেন্নাবাসভান্না, মেথু ভার্গিস এবং প্রভা এস. চন্দ্র।

৪। সাব গ্রুপ রিপোর্ট - একাদশ পরিকল্পনায় চাইল্ড প্রোটেকশন (২০০৭-২০১২), নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

৫। বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০০৬-২০০৭, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

৬। অ্যা রিপোর্ট - ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ডিভেলপমেন্ট অব্ চিলড্রেন ফর ইলেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

৭। স্টাডি অন্ চাইল্ড এবিউজ্ - ইন্ডিয়া ২০০৭, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

৮। ন্যাশ্ন্যাল্ প্ল্যান অব্ একশন্ ফর চিলড্রেন - ২০০৫, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

৯। ট্রেনিং ম্যানুয়্যাল ফর কমব্যাটিং ট্রফিকিং ইন উইম্যান এন্ড চিলড্রেন, সেভ দ্যা চিলড্রেন, ইউ.কে।

১০। চাইল্ড্ প্রটেকশন্ - আ হ্যান্ড্ বুক ফর টিচার্স, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, ২০০৬।

১১। চাইল্ড্ প্রটেকশন্ - আ হ্যান্ড্ বুক ফর পঞ্চায়েত মেম্বার, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, ২০০৬।

১২। চিলড্রেন রাইটস এন্ড্ রেসপনসিবিলিটিস - ইউনিসেফ।

১৩। চাইল্ড প্রোটেকশন্ - আ হ্যান্ড্ বুক ফর পার্ল্যামেনটারিয়ানস্, ইনটার পার্ল্যামেনটারী ইউনিয়ন এন্ড ইউনিসেফ, ২০০৪।

১৪। কমব্যাটিং চাইল্ড ট্রাফিকিং, অ্যা হ্যান্ড্ বুক ফর পার্ল্যামেনটারিয়ানস্, ইনটার পার্ল্যামেনটারী ইউনিয়ন এন্ড ইউনিসেফ, ২০০৫।

১৫। ইন্ডিয়া, বিল্ডিং প্রোটেক্টিং এনভাইরনমেন্ট ফর চিলড্রেন, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, ২০০৬।

১৬। চিলড্রেন্ ইন ইন্ডিয়া এন্ড দেয়ার রাইটস্, ডঃ সবিতা ভাখ্রি, ন্যাশন্যাল হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, ২০০৬।

২.৯ অনুশীলনী

১। এটাচমেন্ট থিওরি কীভাবে শিশু বিকাশের চাহিদাকে বিশ্লেষণ করে?

২। শিসুদের সুষম বিকাশের জন্য পিতা-মাতা, পরিবার ও বন্ধুদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। ভারতে শিশু বিকাশ সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচি আলোচনা করুন।

৪। শিশু সুরক্ষা বলতে কী বোঝেন? সাংবিধানিক সুরক্ষা ও শিশুর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৫। শিশুদের অপব্যবহার সম্বন্ধে লিখুন। শিশুদের অপব্যবহারের ধরন ও প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। চাইল্ড ট্রাফিকিং বলতে কী বোঝেন? ট্রাফিকিং এর কারণগুলি এবং এর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

একক ঃ ৩ বার্ধক্যের যত্ন

গঠন

৩.১ সূচনা

৩.২ ধারণা

৩.৩ ভারতবর্ষে বয়স্ক মানুষদের জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য

৩.৪ সমস্যা

৩.৫ বয়স্ক কল্যাণ কর্মসূচি

৩.৬ বয়স্কদের যত্নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের ভূমিকা

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৮ অনুশীলনী

৩.১ সূচনা

মানুষের জীবন-প্রাক্‌শৈশব (ইনফ্যান্সি), শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় এই পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। প্রতিটি অবস্থার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা রয়েছে। প্রাক-শৈশবে (ইনফ্যান্সি) শৈশবকাল নির্ভরশীল অবস্থা। কৈশোর হল শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণের ধাপ। যৌবন কর্ম-চঞ্চল আর প্রৌঢ় অবস্থায় বিদায় লগ্নের জন্য প্রস্তুতি। মানুষ একটি জীব মাত্র এবং তার জীবন কতকগুলি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে প্রৌঢ়কালে সমাপ্ত হয়।

৩.২ সূচনা

মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্বলতার কারণে শারীরিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অক্ষম হয়ে পড়া ব্যক্তিরা বয়স্ক বা প্রৌঢ় বলে পরিচিত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাগুলি ক্রমশ কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং মানুষের বাহ্যিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। ভারতে আমরা সাধারণত ষাট বছর অতিক্রান্ত মানুষদের প্রৌঢ় বলে চিহ্নিত করি। প্রৌঢ়ত্ব কোন রোগ নয়, এটি মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক অবস্থা। বহুলপ্রচলিত ধারণা হচ্ছে – বয়স্করা অসুস্থ, দুর্বল এবং বিভিন্ন রোগের শিকার। সুতরাং, সংক্ষেপে বলা যায় যে ষাট বছর অতিক্রান্ত মানুষেরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় প্রৌঢ়।

৩.৩ ভারতবর্ষে বয়স্ক মানুষদের জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য

যে কোন দেশের জনগণকে বয়স লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বাসস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পেশা অনুসারে শ্রেণি বিন্যাস করা যায়। বয়স অনুসারে মানুষকে আমরা ছোট শিশু, শিশু, কিশোর, যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করি। গত শতকের শুরুতে প্রায় ১২০ লক্ষ বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। শতকরা হার হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু, আয়ুষ্কাল বেড়ে যাওয়ায় বয়স্ক মানুষের সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে। ১৯৭০-৭৫ সালে আমাদের গড় আয়ু ছিল ৪৪.৭, আর ১৯৯১-৯৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০.৩। সঙ্গতভাবেই ২০০১ সালে বয়স্ক মানুষের হার দাঁড়ায় ৭.৭ শতাংশ। যা ২০২০ সাল নাগাদ ১১ শতাংশে পৌঁছাবে বলা আশা করা যায়। সংখ্যা হিসাবে ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে যথাক্রমে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ও ৭ কোটি ছিল। যা, ২০০৫ সাল নাগাদ ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ হতে পারে।

৩.৪ সমস্যা

বয়স্ক মানুষেরা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। বস্তুতপক্ষে, ভারতবর্ষের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স্ক মানুষের সমস্যাকে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাঁদেরকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে তা নিম্নরূপ–

(ক) পারিবারিক সমস্যা

বৈদিক যুগে আমাদের যৌথ পরিবারের রীতি ছিল। ঐরূপ পরিবারে বয়স্ক মানুষের সমস্যা খুব বেশি দেখা যেত না কারণ সেখানে নিরাপত্তাহীনতার কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে কেন্দ্রীভূত পরিবারের দিকে আমাদের প্রবণতা এবং ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক মূল্যবোধ বয়স্ক মানুষদের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। এরূপ পরিবারে সঠিকভাবে বয়স্ক মানুষের যত্ন করা সম্ভব হয় না এবং তাঁরা একাকীত্ব অনুভব করেন। অনেক ক্ষেত্রে নবীন প্রজন্ম তাঁদেরকে বোঝা বলে মনে করে এবং অমানবিক ব্যবহার করে। শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন দেওয়া হয় না। যার ফলে বয়স্ক মানুষেরা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হন এবং যা থেকে হতাশা, ক্ষোভ, ক্রোধ এবং অসহায়বোধের উৎপত্তি। তাঁদের অনুভূতি বুঝবার চেষ্টা করা হয় না।

(খ) অর্থনৈতিক সমস্যা

যেহেতু, বয়স্করা শারীরিক কারণে কাজ করতে পারেন না তাই তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল। আর্থিক ব্যাপারে ছেলে-মেয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। যার ফলে তাঁর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে না।

অন্যদিকে তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অর্থনৈতিক বিষয় তাঁকে পরিবারের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। ভারতে অধিকাংশ বয়স্ক মানুষ অর্থনৈতিকভাবে অসহায়।

(গ) স্বাস্থ্য সমস্যা

বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষ শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্যা শুরু হয়। শরীরের

প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। দেখা গেছে প্রায় অর্ধেক বয়স্ক মানুষ দীর্ঘকালীন রোগে ভুগছে। বয়স্ক মানুষদের দশটি সাধারণ রোগ হল - ছানি, উচ্চ মানসিক চাপ, পাত, হৃদরোগ, বহুমূত্র, প্রোস্টেট গ্রন্থির সমস্যা, অজীর্ণতা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অবসাদ, ফুসফুসের রোগ ইত্যাদি। এই সকল রোগ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ। এক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ যত্ন ও সহায়তার দরকার যা সাধারণত দেখা যাচ্ছে না। এই সকল সমস্যার সঙ্গে বধিরতা, অন্ধত্ব, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। বয়স্ক মানুষের মৃত্যুর ছয়টি সাধারণ কারণ হল - ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, হৃদ রোগ, সেরিব্রাল বা কার্ডিয়াক স্ট্রোক, ফুসফুসের রোগ, ক্যানসার এবং যক্ষা।

(ঘ) গৃহ সমস্যা

বৃদ্ধরা সাধারণত গৃহ সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষ করে শহর এলাকায় যেখানে ফ্ল্যাটে বসবাস সেখানে সচরাচর এই সমস্যা দেখা যায়। ঐ সকল ছোট ফ্ল্যাটে তাদের উপযুক্ত বসবাসের স্থান থাকে না। মুক্তভাবে বসবাসের জায়গা থাকে না। আমাদের মানসিক চিন্তাভাবনাও এই সমস্যার জন্য কিছুটা দায়ী। মানুষ আজকাল একক পরিবারে বসবাস করতে ভালোবাসে। যার ফলে বয়স্ক মানুষদের থাকার সমস্যা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধাশ্রম এরই ফলশ্রুতি।

(ঙ) সামাজিক সমস্যা

শারীরিক এবং অর্থনৈতিক অক্ষমতার কারণে বয়স্ক মানুষেরা পরিবারে মর্যাদা পায় না যা সে যৌবনে কর্মরত অবস্থায় পেত। সমাজের জন্যেও তেমন কিছু করতে পারে না। ফলে সামাজিক পদমর্যাদাও খুব একটা থাকে না। স্বাভাবিক ভাবেই অসহায় এবং হতাশার শিকার হন। আত্ম-মর্যাদা হারানো বয়স্ক মানুষদের একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। তারা একই ছাদের তলায় বাস করলেও কিছুটা একাকীত্ব অনুভব করে। এখান থেকেই অসহায়তা, মানসিক যন্ত্রণা ও হতাশার উৎপত্তি।

৩.৫ বয়স্ক কল্যাণ কর্মসূচি

ভারতবর্ষের মতো দেশে বয়স্কদের জন্য খুব বেশি পরিষেবা নেই। ভারত সরকার ন্যূনতম কিছু পরিশেবা চালু করেছে। রাজ্য সরকারও কিছু পরিষেবা প্রদান করে। কিছু কিছু রাজ্য সরকার বৃদ্ধভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যদিও ভাতার পরিমাণ খুবই কম। কিছু বে-সরকারি সংস্থা বড় বড় শহরে বৃদ্ধাশ্রম চালাচ্ছে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় প্রতিটি রাজ্যে অসহায়, ভিক্ষায় নিযুক্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধার জন্য ভবঘুরে আবাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশে নিম্নলিখিত পরিষেবা রয়েছে –

(১) ন্যাশন্যাল পলিসি ফর্ ওলডার পারসনস্ (এন.পি.ও.পি.)

এই নীতি ১৯৯৯ সাল থেকে চালু হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল–

(ক) বৃদ্ধ বয়সের উদ্দেশ্যে আগাম কিছু ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা।

(খ) বয়স্কদের যত্নের ব্যাপারে পরিবারের সদস্যদের উৎসাহিত করা।

(গ) বে-সরকারি, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিপূরক পরিষেবা প্রদানের জন্য সহায়তা।

(ঘ) বয়স্ক মানুষদের গোষ্ঠী ও সংগঠনের সুরক্ষা, তত্ত্বাবধান।

(ঙ) বয়স্কদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা।

(চ) বয়স্কদের পরিষেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা।

(ছ) বয়স্কদের সমস্যা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা।

(২) ন্যাশ্‌ন্যাল কাউনসিল ফর্‌ ওলডার পারসনস্‌ (এন.সি.ও.পি.)

উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ভারত সরকার ন্যাশ্‌ন্যাল কাউনসিল ফর্‌ ওলডার পারসনস্‌ স্থাপন করেছে। এর দায়িত্ব হল বয়স্ক মানুষদের জন্য নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া। বয়স্কদের কল্যাণে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবায় কার্যকারিতা সম্বন্ধে সরকারকে মতামত দেওয়াও এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। বস্তুতপক্ষে, এটি হল বয়স্ক কল্যাণে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার সর্বোচ্চ সংস্থা।

(৩) ইন্টিগ্রেটিড্‌ প্রোগ্রাম্‌ ফর্‌ ওলডার পারসনস্‌ (আই.পি.ও.পি.)

বয়স্কদের অবস্থার উন্নতির জন্য এটি আর একটি পরিষেবা। বে-সরকারি সংস্থার মাধ্যমে বৃদ্ধাশ্রম, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা, ডে কেয়ার সেন্টার ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনার জন্য মোট প্রকল্প বাজেটের ৯০ শতাংশ এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেওয়া হয়। তাছাড়া, বৃদ্ধদের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। এই প্রকএল্পর অধীনে ২০০৪-০৫ সালের ৪৪৪টি সংস্থা আর্থিক সহায়তা লাভ করে। ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ২০০৬ সালে বিধান সভায় বয়স্কদের স্বার্থ রক্ষার্থে একটি বিল পাশ করেন। এর ফলে সন্তানের দ্বারা বঞ্চিত পিতামাতার পক্ষে সুরক্ষা ও আশ্রমের দাবি করা সহজতর হয়েছে। তাদের শুধু পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে। বাকি কাজ রাজ্য সরকার করবে। ঐ বিলে বলা হয়েছে উপার্জনকারী সন্তানের গৃহে বৃদ্ধ পিতামাতার বসবাসের অধিকার রয়েছে।

বৃদ্ধাশ্রম ও বহুমুখী পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পঞ্চায়েত, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও স্ব-নির্ভর মহিলা গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষে আর একটি উল্লেখ্যযোগ্য বয়স্ক কল্যাণ প্রকল্প রয়েছে এই প্রকল্পের অধীনে ২০০৪-০৫ সালে ছয়টি সংস্থাকে ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

এই কাজে অন্যতম পারদর্শী হেলপ, এজ্‌ ইন্ডিয়া নামে একটি সংস্থা ১৯৭৮ সাল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করে চলেছে। এই সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় দিল্লিতে অবস্থিত। তাছাড়া এর শাখা কার্যালয় সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে বয়স্ক মানুষদের জন্য জাতীয় নীতি ঘোষণা করা হয়। এই নীতির উদ্দেশ্য হল এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যাতে বয়স্ক মানুষরা তাদের জীবনের শেষ দিনগুলি অর্থবহভাবে, শান্তিতে ও মর্যাদা সহকারে কাটাতে পারে। এই সংস্থা, জাতীয় নীতির উপর ভিত্তি করে জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি ও প্রকল্প রূপায়ণ যাতে হয় তার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। হেলপ এজ্‌

ইন্ডিয়া নিজে থেকে তৃণমূল স্তরে সংগঠন তৈরি সহ বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদান করছে। বয়স্কদের জন্য এদের পরিষেবা নিম্নরূপ–

(ক) বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা

অনেক বয়স্ক মানুষকে পরিবার থেকে বিতাড়িত হতে হয়। অনেক সময় তাদের প্রতি এমন খারাপ ব্যবহার করা হয় যে তারা স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য প্রথমে একটি আশ্রমের প্রয়োজন। সরকারি এবং বে-সরকারি সংস্থার উদ্যোগে দেশের প্রায় সর্বত্র এই ধরনের বৃদ্ধাশ্রম স্থাপিত হয়েছে। প্রায় অর্ধেক এরূপ বৃদ্ধাশ্রম হেলপ এজ্ ইন্ডিয়ার আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত। এই সব আশ্রমের বাসিন্দারা ভালোবাসা, যত্ন এবং সুরক্ষা পেয়ে থাকে।

(খ) ডে কেয়ার সেন্টার পরিচালনা

বয়স্ক মানুষ যারা কোন না কোন কারণে গৃহে থাকতে পারে না তারা এই ডে কেয়ার সেন্টারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এই সব সেন্টারের বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদান করা হয় যেমন– (১) আয় বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, (২) স্বাস্থ্যের যত্ন, (৩) পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা, (৪) সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা ও বন্ধুত্বের সুযোগ যা এই বয়সে খুবই জরুরী ইত্যাদি।

(গ) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা

যে সকল সংস্থার কর্মীরা বয়স্কদের কল্যাণে নিযুক্ত হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে বার্ধক্যের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করা হয় এবং যাতে সঠিকভাবে ঐ সব মানুষের যত্ন নিতে পারে তার জন্য দক্ষ করে তোলা হয়। এই দক্ষতা বৃদ্ধি খুবই প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী।

(ঘ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

সমস্ত বৃদ্ধ কিন্তু শারীরিক দিক থেকে অক্ষম নন। তাদের অনেকেই এখনো কাজ করতে পারে। সুযোগ পেলে তাদের অনেকে কাজ করে আয় করবে। হয়তো বেশি আয় করতে পারবে না কিন্তু যতখানি আয় করবে তা হাতখরচের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং সর্বোপরি অর্থবহভাবে সময় কাটাতে পারবে। এই কথা বিবেচনা করে হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এমন কি স্বল্প-সঞ্চয় কর্মসূচি চালু করেছে যেখানে তারা অল্প অল্প টাকা জমাতে পারবে এবং প্রয়োজন মতো টাকা তুলে খরচ করতে পারবে।

(ঙ) চক্ষু যত্ন পরিষেবা

স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধদের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এটি এমন একটি সমস্যা যা মানুষকে অসহায় ও অক্ষম করে তোলে। হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া চক্ষু অপারেশন শিবিরের মাধ্যমে ছানি নিরাময়ের ব্যবস্থা করে। বলা বাহুল্য, বয়স্ক মানুষদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা।

(চ) ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র

হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া কেবলমাত্র বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারী ও ডে কেয়ার সেন্টারে আগত ব্যক্তিদের পরিষেবা

প্রদান করে না, পরিবারের মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের জন্যেও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা দেয়। নিকটবর্তী পরিকাঠামোর অভাবে কিংবা অর্থনৈতিক কারণে বয়স্ক মানুষরা চিকিৎসার সুবিধা পায় না। হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া তাদের হাতের কাছে পৌঁছে যায় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দেয়। তাদের এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র বয়স্ক মানুষদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে এবং স্বাস্থ্যের জন্য অপরকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করে।

(ছ) মনিটরিং মূল্যায়ন

অন্তর্বিভাগীয় ও বহির্বিভাগীয় পরিষেবার গুণগত মানের পর্যালোচনার জন্য হেলপ এজ্ ইন্ডিয়া নিয়মিত তাদের পরিষেবার তদারকি ও মূল্যায়ন করে।

৩.৬ বয়স্কদের যত্নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের ভূমিকা

বয়স্ক মানুষের সমস্যা লাঘবে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা বয়স্কদের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ দিতে পারে। তারা বোঝাতে পারে যে বয়স্কদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ইত্যাদি শিশুদের শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ সহ বিভিন্ন কাজে লাগতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বয়স্ক মানুষরা যাতে তাদের মানসিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারে। এটা বিশেষ করে বৃদ্ধাশ্রমে সম্ভব। তাছাড়া, পার্ক, প্ল্যাটফরম, মন্দির ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে তারা প্রায় দিন একত্রিত হয়। সেখানে সমাজকর্মীরা সাক্ষাৎ করে গ্রুপ কাউন্সেলিং করতে পারে। জীবনের এই পর্যায়কে সাদরে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে। তাদের বোঝাবার দরকার তারা যেন নিজের প্রতি কর্তব্য করতে পারে এবং পরিবারে ও সমাজে তাদের ভূমিকা রয়েছে।

তৃতীয়, তারা নেতার মতো বৃদ্ধ মানুষের সমস্যা সরকার ও সমাজের কাছে তুলে ধরতে পারে যাতে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হয় এবং সমস্যা লাঘবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চতুর্থত, সমাজকর্মীরা অর্থ সংগ্রহ করে বয়স্ক মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারে। তারা যাতে অর্থকরী কাজে যুক্ত হয়ে নিজেদের জন্য কিছু আয় করতে পারে তার জন্যও সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু, সমাজকর্মীদের মনে রাখতে হবে যে এই বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। সুতরাং,

(ক) ক্লায়েন্টের আস্থা অর্জন করতে হবে।

(খ) সমস্যা প্রকৃতি, গভীরতা এবং সমস্যার দিকগুলি ভালো করে জানবে।

(গ) কী ধরনের সাহায্য দরকার তা স্থির করবে।

(ঘ) কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তার পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং গুরুত্ব সহকারে তালিকা করবে।

(ঙ) নথি এবং তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখবে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের উপলব্ধি করা দরকার যে ভারতে বৃদ্ধদের সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সুবিধা হবে। হাজার হাজার বে-সরকারি সংস্থা দেশে কাজ করছে কিন্তু প্রায় কেউই এই সমস্যা গুরুত্ব সহকারে সমাধান করার চেষ্টা করছে না। বে-সরকারি সংস্থাগুলির উপলব্ধি করা দরকার যে বয়স্কদের কল্যাণ তাদের অন্যতম কাজের ক্ষেত্র হতে পারে। বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত যুব সংগঠনগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যদি সংশ্লিষ্ট সকলে গুরুত্ব সহকারে সমস্যা উপলব্ধি করে এবং তার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে সমস্যা অনেকটাই লাঘব হবে।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

(১) ইন্ডিয়া - ২০০১, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার।

(২) হেলথ্ কেয়ার অব্ দ্য এল্ডারলি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আই. আই. এম. এস., স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক।

৩.৮ অনুশীলনী

(১) বৃদ্ধ বয়স কথাটির অর্থ কী? বয়স্কদের মূল সমস্যাগুলি কী কী ?

(২) বয়স্কদের কল্যাণে সরকার ও বে-সরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি আলোচনা করুন।

(৩) বয়স্কদের কল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করুন।